আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার অষ্টম এ

শাশ্বত ভিখারী

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ,

ভাদ্র ১৩২৩

Published by
GURUDAS CHATTERJEA
MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis Street, Calcutta.



Printed by
RADHASYAM DAS
AT THE VICTORIA PRESS,
2, Goabagan Street, Calcutta.

শাশ্বত ভিখারী

পূজার ছুটি

কা'ল শারদীয়া ষষ্ঠী। বাটীতে পূজা। বিশ্বম্ভরবাবু বাটীতে আসিতেছেন। পল্লীগ্রামের কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া গরুর গাড়ী খুব চলিয়া আসিতেছে। গাড়ীতে বিশ্বম্ভর বাবুর সঙ্গে তাঁহার কলেজের সহপাঠী বন্ধু হরিদাস। তখন প্রায় সন্ধ্যা, সূর্য্যের শেষ কিরণপাতে বাতকম্পিত বাঁশপাতাগুলি চক্‌চক্ করিয়া উঠিতেছে, দূরে কেয়াফুলের শ্যামোজ্জ্বল ঝাড় দেখা যাইতেছে। বাঁশতলায় অন্ধকার, ঝিঁঝিঁ পোকাগুলি ইতিমধ্যেই তাহাদের বাজনা সুরু করিয়াছে। বনে ঘেরা পানা-পুকুরে অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, একটা পচা গন্ধ উঠিতেছে। পুকুরের অপর পাড় হইতে একটা শৃগাল উঁকি মারিয়া দূরে চলিয়া গেল। কয়েকটা ছাতার পাখী খুব কর্কশ-স্বরে ডাকিয়া উঠিল।

বিশ্বম্ভর বাবু হরিদাসকে বলিলেন, "হরি, দেখ্‌ছ, প্রত্যেক বছরই যে বনজঙ্গল বেড়ে উঠ্‌ছে।" "গ্রামে ঢুকতে যেন একটু ভয় হচ্ছে। ঐ সামনের বাঁশগাছগুলি একবারে পথের উপরে

ঝুঁকে পড়েছে ; এমনি করে যদি জঙ্গল বাড়ে, তা হ'লে শেষে গ্রাম না ছাড়্তে হয়।" "ছাড়্তে হবে না ত কি? কে এই বন জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করতে পারে? আমার আর কি? আমি ত আসি একবার পূজার সময়ে, সে আসাও বন্ধ করে দেব। বন জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, পচা জল খেয়ে আমি ত মরতে পারি না।" "তাই ত, যতই চল্‌ছি সবই ত জঙ্গল দেখ্‌ছি। হাঁরে গাড়োয়ান, এবার এত জঙ্গল হ'ল কেন জানিস্?"

গাড়োয়ানের নাম কেলো। সে এতক্ষণ বাবুদের কথা-বার্ত্তা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। তাহার খুব ইচ্ছা হইতে-ছিল সে দুই একটা কথা বলে। কিন্তু কাহার সঙ্গে কথা? জমিদার বিশ্বম্ভর বাবু স্বয়ং, তাঁহাকে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে। কেলো বিশ্বম্ভর বাবুর পিতাকে বেশ জানিত, তিনিও তাহাকে স্নেহ করিতেন। তিনি এখন পরলোকগত। কেলো গাড়োয়ান এখন বিশ্বম্ভর বাবুর পিতার স্নেহের দাবী ত তাঁহার নিকট করিতে পারে না। পুত্র এখন সহরে পড়েন, গ্রামে থাকেন না। গ্রামবাসিগণের সকলের সঙ্গে পিতার যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, পুত্রের তাহা নাই। বিশেষতঃ কেলোর ন্যায় শ্রেণীর লোককে বিশ্বম্ভর বাবু ত চিনিবেনই না। কেলো এই সব চিন্তা করিতেছিল। একই সঙ্গে বিশ্বম্ভর বাবুর পিতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি স্নেহ, বিশ্বম্ভর বাবুর ঔদাসীন্যে একটা দুঃখ ও নিজের প্রতি একটা রাগ তাঁহার মনকে তোলপাড় করিতেছিল। যখন সে একটু অধীর হইতে-

ছিল, তখন একটা গরুর লেজ খুব জোরে মলিয়া, "আরে ডান, ডান, ভাগাড়ে যা" এই সুমিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। অপরের নিকট যখন কেহ ঘৃণা ভিন্ন আদর পায় না, তখন প্রতিশোধ দিতে না পারিলে সে যাহাকে অসহায় পায়, তাহারই প্রতি নিষ্ঠুর হয়। গরুটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া মাথা নীচু করিয়া দক্ষিণদিকে যখন জোরে সরিয়া যাইতেছিল তখন তাহাকে আবার সামলাইতে হইতেছিল।

কেলো বিশ্বম্ভর বাবুর প্রশ্ন শুনিয়া কৃতার্থ বোধ করিল। "বাবু, জঙ্গল হবে না, এবার যে বাণ এসেছিল। সেই আষাঢ় মাসে, আপনি জানেন না? তা জানবেন কি করে, আপনি এখন সহরে থাকেন। এবার কিছু ফসল হয়নি। সব লোক 'হা ভাত, হা ভাত' কর্‌ছে! বাবু, আমরা সব গরীব লোক।"

বিশ্বম্ভর বাবু ও হরিদাস বাণের কথা জানিতেন, কিন্তু 'হা ভাতের' খবর তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছায় নাই। বিশ্বম্ভর বাবুর নায়েব তাঁহাকে গ্রামের বিশেষ খবর দিতেন না, শুধু বাটীর লোকের স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে পত্র দিতেন, এবং জমিদারী সংক্রান্ত বিশেষ কোন গোলমাল বাধিলে, তাঁহার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই যাহা হয় একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতেন। আর হরিদাস? সে ত গ্রামের খোঁজই লয় নী। তাহার ভাই দেবীদাস দুই বোনের মধ্যে কাহারও অসুখ হইলে তাহাকে চিঠি দেয়। সে সংবাদের জন্য হরিদাসের বিশেষ কোন আগ্রহ নাই; কিন্তু বাটী হইতে মাস মাস সময় মত

[illegible] বোর্ডিংয়ের খরচের জন্য টাকা না আসিলে, তাহার প্রত্যেক দিন একখানা করিয়া তাগাদা দেওয়া চাই। দেবীদাস ভাবিত, দাদা খুব পড়ায় ব্যস্ত। বোনেরাও তাহার নিকট শুনিয়া তাহাই ভাবিত; তাহারা কেহই জানিত না যে, হরিদাস বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গে তাসখেলায়, গল্প আমোদে এত ব্যস্ত যে তাহার নিজের গৃহছবি তাহার মন হইতে একবারেই মুছিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত এখন গৃহের সম্বন্ধ হইয়াছে, টাকা লইয়া। পোষ্ট আফিসের পিওন যখন তাহার ঘরের নম্বর খুঁজিয়া তাহার সম্মুখে টাকাগুলি গণিয়া দিত, তখন হরিদাস জানিত দেবীদাস ভাল আছে, সতী ভাল আছে, আর হৈমবতী ভাল আছে।

বিশ্বম্ভর বাবু বলিলেন, "হরি, তুমি জানিতে না, বাণ এসেছিল?" "না, আমাকে ত কেহ চিঠি দেয় নাই।" হরিকে দেবীদাস একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, তাহাদের একখানি ঘর বর্ষায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বোর্ডিংয়ের খরচ কিছু কমাইয়া ঘর তৈয়ারী করিয়া লইবে কি না, দেবীদাস তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কোন উত্তর না পাওয়ায় সে সমান টাকা পাঠাইয়াছে। ঘর মেরামত করা হয় নাই। হরিদাসের এ সব কিছুই মনে নাই।

কেলো গাড়োয়ান হরিদাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভট্টাচায্যি বাড়ীর ছেলে?" কেলো তাহাকে কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিল না বুঝিয়া, সে তাহার কোন উত্তর না দিয়া শুধু ঘাড় নাড়িল।

দুই বন্ধু এরূপে আলাপ করিতে করিতে শীঘ্রই গ্রামে পৌঁছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। গ্রামের ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীরা সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেছেন। হাটের কাপড়ের দোকানে বসিয়া কতকগুলি লোক খুব গোলমাল করিতেছে, একজন তাহাদের মধ্য হইতে সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেছে—

"আমার উমা এলো
বলে রাণী এলো কেশে ধায়"

গানের এই দুইটি পদ ভিন্ন আর পদ শুনা গেল না। আরোহী-সমেত গাড়ীখানা গন্তব্যপথে চলিয়া গেল।

আনন্দ

কেলো ওরফে কালাচাঁদের সম্পত্তির মধ্যে একখানা গাড়ী, একজোড়া বলদ, আর একখানা মেটে ঘর—যা তার আপনার। ঘরখানির বাহিরে সে একান্ত পরের চাকর; যে যাহা বলে তাহা শুনে, কাহাকেও অবজ্ঞা করে না। সমস্ত দিন সে গাড়ী বহে। ষ্টেশন হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে ষ্টেশন, সে ক্রমাগত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যাওয়া আসা করিতেছে। যাওয়ার ভাড়া ছয় আনা, আসার ভাড়া ছয় আনা। তাহার বেশী কম নাই। যখনই কেলোকে বলিবে তখনই সে যাইবে। ভোর পাঁচটার গাড়ী ধরিবার জন্য কেহ যদি রাত তিনটার সময়

আসিয়া কেলোকে জাগায়, সে অনতিবিলম্বে গরু দুটাকে লইয়া নির্দ্দিষ্টই সময়ে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবে। ষ্টেশনে মোট মাথায় করিয়া রেলের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলে যদি যাত্রী তাহাকে দুই চারি পয়সা দেয়, তাহা হইলে সে সেটাকে উপরি পাওনা মনে করিয়া বিশেষ সন্তোষই লাভ করে। "বাবু, প্রণাম হই" বলিয়া আনন্দে গ্রামে ফিরিয়া যাইবার সওয়ারীর খোঁজে চলিয়া যায়। কেহ তাহাকে সেই দুই চারি পয়সা হইতে বঞ্চিত করিলেও সে তাহাকে "বাবু, প্রণাম হই" বলিতে ভুলে না।

কেলো আপনার কুটিরে পৌছিল। কুটিরে সে আপনার প্রভু আপনি। আপনার কুটিরেই কেলোর একমাত্র স্থান, যেখানে তাহার আত্মমর্য্যাদা, আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন ব্যাঘাত হয় না। কেলো এ সব ঠিক বুঝে না, অথবা বুঝিয়াও বুঝে না; কিন্তু সে স্পষ্ট বুঝে জগতে এই কুটিরই তাহার একমাত্র স্থান, যেখানে সে পরম সুখ, শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। এই ভাঙ্গা কুটিরটুকু না থাকিলে তাহার যে কি অশান্তি ও দুঃখ আসিবে তাহা মাঝে মাঝে সে কল্পনা করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। একদিন তাহার স্ত্রীকে সে কল্পনার কথা বলিয়াছিল। তাহার স্ত্রী বলিয়াছিল, "মরণ আর কি, মিন্‌সের কথা দেখ! আমি কি ভিক্ষা মেগে খাব?" সেই হইতে কেলো এ সব কল্পনা ছাড়িয়া দিয়াছে। ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়া মনে অশান্তি আনা সে প্রয়োজন মনে করিত না। বর্ত্তমান সুখ শান্তি ও আনন্দে সে বেশ আছে।

কেলো আপনার কুটিরে পৌঁছিয়া সুধাকে ডাকিল, "সুধী, তোর মাকে ডাক্। গরু দুটো খুব খেটেছে। জাবি দিগ্ গে।"

সুধা তাহার মাকে ডাকিল। সে গরুকে খাওয়াইতে গেল।

ইতিমধ্যে কেলো ঘরে ঢুকিয়া খানিকটা গুড় ও জল খাইয়া লইল, এবং গাড়ীটা আঙ্গিনার এক পাশে রাখিয়া গাড়ীর ভিতর হইতে একটা ছোট পুঁটুলী লইয়া আসিল।

পুঁটুলীতে সুধার মার একখানা কাপড়, জামা ও সুধার একখানা কাপড় ও জামা। পিতা নিজেই কন্যাকে কাপড় ও জামা পরাইয়া দিল। সুধা যখন তাহার লাল কাপড় ও নীল জামা পরিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহার মার কাছে ছুটিয়া গেল, তখন কেলোর আর আনন্দ ধরে না।

"মা, বাবা আমার কেমন কাপড় এনেছে দেখ। খুব ভাল।"

"কই, সুধা, দেখি" বলিয়া তাহার মা ছুটিয়া আসিল। তাহার হাতে তখনও খড় ভূসি লাগিয়া রহিয়াছে।"

"মা, ছুঁস্নি, কাপড় খারাপ হবে।"

দূর হইতে মা কন্যার সুন্দর কচি মুখখানি অনিমেষ নয়নে দেখিতেছিল। লাল কাপড় পরিয়া সুধাকে কি সুন্দরই দেখাইতেছিল। মা তাই তাহাকে মন প্রাণ দিয়া দেখিতেছিল —কখন অতর্কিতভাবে তাহার আঁচল খসিয়া পড়িয়াছিল, সে

তাহা দেখে নাই। পিতাও নিকটে আসিয়া সেই দৃশ্য দেখিল। স্বামীকে তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সুধার মা তাহার ঘোম্‌টা একটু টানিয়া লইল। দুইজনেই কন্যার দিকে সস্নেহে স্থির দৃষ্টিপাত করিল! সে সময়ে স্বর্গের দীপ্তিতে সুধার হাসিমুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই।

আজ যে উমা কৈলাস হইতে কেলো গাড়োয়ানের ভগ্ন-কুটিরেই আসিয়াছেন। বিশ্বম্ভর বাবু বা হরিদাসের বাটীতে উমা পদার্পণ করেন নাই।

বঞ্চিত

কিন্তু পূজার ধুম বেশী হইল বিশ্বম্ভর বাবুর বাটীতে। বিশ্বম্ভর বাবু জমিদার, তাঁহার বাটীতে পূজা উপলক্ষে গ্রামের সমস্ত লোকই নিমন্ত্রিত হইল। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, রোজই প্রায় হাজার লোকের নিমন্ত্রণ। তাহা ছাড়া গরীব লোক সব অনিমন্ত্রিত, রোজ আসিয়া খাইয়া যায়। কয়দিন গ্রামে খুব উৎসব—উৎসব হইতেছে বাবুর বাড়ী গিয়া প্রতিমা দেখা, নিমন্ত্রণ রক্ষা করা। গরীব লোক অনিমন্ত্রিত হইলেও নূতন কাপড় পরিয়া স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া প্রতিমা দেখিয়া যায়। বিশেষতঃ সন্ধ্যার আরতির সময়ে পূজার দালানে এরূপ ভিড় হয় যে, ঠেলাঠেলিতে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। আরতি হইতেছে, এমন

সময়ে কোন স্ত্রীলোকের হয় ত নূতন কাপড় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে, আর একজন তাহা না দেখিয়া পায়ের তলে চাপিয়া রহিয়াছে! শেষে আরতির ঘণ্টা ভেদ করিয়া গালাগালি শুনা গেল। প্রথমে শ্লেষের কথা, এক কথার উপর আর এক কথা, তাহার উপর আর এক উঁচু কথা, ক্রমশঃ গলা উঠিতে থাকে। নায়েব বাবু নিজে আসিয়া আরও উঁচু গলায় খুব ধমক দিলে, তখন গোলমাল থামে।

দ্বিপ্রহরেও হট্টগোল। পূজার দালানের সম্মুখের রোয়াকে সারে সারে লোক, ভিতর বাটীর দালানের রোয়াকে সারে সারে লোক, যেখানে স্থান পাইয়াছে সেখানে লোক যাইতেছে। খাওয়া শেষ হইলে পাতা পরিষ্কার করিতে না করিতে আবার লোক বসিতেছে, এরূপ সমস্ত দিনই চলিতেছে। যাহারা গরীব লোক তাহারা পাতা চাহিয়া অথবা কাড়িয়া লইয়া উঠানে বসিয়া গিয়াছে। খুব গোলমাল, বিশেষতঃ উঠানে পরিবেশন করিবার জন্য লোকাভাব, অথবা লোক থাকিলেও তাহাদের অনিচ্ছা, কাজেই সেখানে বেবন্দোবস্ত।

বিশ্বম্ভর বাবু মাঝে মাঝে লোকজনের খাওয়া দাওয়া দেখিতে আসিতেছেন। তিনি আসিলে সব স্থির, কোন গোলমাল নাই। কিন্তু উঠানে নামিতে না নামিতে, সমস্বরে অনেক লোক চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, "বাবু, আমরা কিছু পাই নাই, কেউ আমাদের দিচ্ছে না।"

বিশ্বম্ভর বাবু অগত্যা কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া

রহিলেন। দেখিলেন সকলেই ভিতরে যেখানে গ্রামের ভদ্র-লোকগণ বসিয়াছেন সেখানে পরিবেশন করিতেছে, বাহিরের উঠানে গরীবলোকদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন দিবার কেহ নাই,—একজন কি দুইজন পাচক বহুক্ষণ অন্তর রান্নাঘর হইতে ইহাদের দিকে তরকারী লইয়া আসিতেছে, আর একজন বালক খুব ভারী একখানি থালায় ভাত আনিয়া পরিবেশন করিতে করিতে গলদঘর্ম্ম হইতেছে। বিশ্বম্ভর বাবু তাহাকে চিনেন, সে হরিদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেবীদাস,—তিনি বলিলেন, "দেবি, তুই অত বড় থালা পারবি কেন? একটা ছোট থালা নিয়ে আয়।" বলিয়া চলিয়া গেলেন। দেবীদাস সেই বড় থালাতেই পরিবেশন করিতে লাগিল। একজন কৈবর্ত্ত অনেকক্ষণ বসিয়াছিল, শেষে অন্নব্যঞ্জন পাইয়া সে বলিল, "ভাগ্যে বাবু ছিলে, ছোট বাবু দেখ্‌ছি ঠিক চাটুজ্যে মশায়ের মতনই হবে, আহা, তাঁর গরীব লোকদিগের প্রতি বড়ই দয়া ছিল, ছোট বাবু না থাকলে আমাকে আজ পাতটাই খেতে হত।" দেবীদাসকে গ্রামের লোকেরা ছোট বাবু বলিত।

এরূপ গোলমালে কয়েকদিন কাটিল। বিশ্বম্ভর বাবু লোকজনের নানা কথায়, নানা চাটুবাক্য শুনিয়া বেশ আমোদে কয়দিন কাটাইলেন। রোজ রোজ অনেক লোক প্রতিমা দেখিল, প্রতিমাকে নমস্কার করিল, অনেক লোক ভোজন করিল, ভোজ্যের প্রশংসা করিল, অনেক লোক

যাতায়াত করিল, আলাপ পরিচয় করিল। পূজার দালানে প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ হইল, সারাদিনই ঢাকঢোল বাজিল।

বিশ্বম্ভরের মন কিন্তু ইহাতে একবারে সন্তুষ্ট ছিলনা। সে বেশ একটু আনন্দ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে একটা অভাব বোধ করিয়াছিল, সে অভাবটা কি তাহা সে নিজে ঠিক বুঝিতে পারে নাই,—কিন্তু একটা সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, সে একটা কিছু হইতে এখনও বঞ্চিত রহিয়াছে, কি হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে তাহা এত গোলমালের মধ্যে তো ভাবিবার অবসর পায় নাই। শেষে বিজয়া দশমীর দিন যখন প্রতিমার সহিত গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর অনেক রাত্রে সে শূন্য দালানে উপস্থিত হইল, এবং শূন্য সিংহাসনের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, তখন বুঝিল সে যেন তাঁহাকে খুব নিকটে পাইয়াও গ্রহণ করে নাই, এবং এই অপরাধের জন্য সে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিলনা। ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া যখন সে গভীররাত্রে শয়ন করিতে গেল, তখন ঠাকুরমার আশীর্ব্বাদ তাহার মনে ছিলনা, সে আপনার অপরাধ চিন্তা করিয়া আপনাকে অত্যন্ত দোষী সাব্যস্ত করিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল, এ কয় দিন সে শুধু মিথ্যা আড়ম্বর আয়োজনে নষ্ট করিয়াছে, পূজার দিনে সে দেবতার পূজা করে নাই, সকলের নিকট চাটুকথা শুনিয়া আপনার বাহাদুরী দেখাইয়া সে নিজেরই পূজা করিয়াছে। তাহার নিজের প্রতি একটা

ঘৃণার উদ্রেক হইল, অন্যলোকের প্রতিও শুধু ঘৃণা নহে ক্রোধও হইল। এরূপ ঘৃণা ও ক্রোধে সে অনেকক্ষণ শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তাহার মস্তিষ্ক উষ্ণ বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর, দিবসের পরিভ্রমণের জন্য অবসাদ আসিল, ঘৃণা দূর হইয়া একটু প্রসন্নতা আসিল, সে ঘুমাইয়া পড়িল।

শিক্ষা

হরিদাস পূজার ছুটীর পর কলিকাতায় চলিয়া গেলে, তাহার ভ্রাতা দেবীদাস নিশ্বাস ফেলিয়া আবার নিজের কাজে লাগিয়া গেল। তাহাদের অবস্থা এমন নয় যে দুই ভ্রাতায় কলিকাতায় পড়িতে পারে। তাহার পিতা যে সামান্য জমি জমা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে কোন প্রকারে তাহাদের দিন কাটে। তাহার ভ্রাতার কলিকাতার খরচও তাহাদের পক্ষে সামান্য নয়। তাহা ছাড়া বাটীতেও তাহার দুই ভগ্নী এবং সে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সে কলিকাতায় বিদ্যার্জ্জনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল তাহার দাদা পাশ করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহাদের আর্থিক কষ্ট দূর হইবে। তাই গ্রাম্য পাঠশালায় সে যেটুকু বিদ্যা শৈশবে অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল, তাহাই তাহার বিদ্যালয়ের বিদ্যা।

পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া সে তাহার অগ্রজের জন্য

স্বীয় বিদ্যার্জ্জনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিষয় আশয় দেখিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু যাহার অন্তরে বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা আছে সে কোন না কোন উপায়ে শিক্ষালাভ করিবেই। প্রকৃতির প্রকাণ্ড বৈথানা খোলা রহিয়াছে; যদি আপনার চিত্ত তাহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে সমগ্র জগৎই আপনার অন্তরের গূঢ় রহস্যগুলি ধীরে ধীরে, শিক্ষার্থীর অজ্ঞাতে, তাহার মনের মধ্যে প্রকাশ করিয়া দিবে। দেবীদাসেরও তাহাই হইল।

গ্রামের লোকে বলিত "ছেলেটা বয়ে গেল।" কেবল চাষাভূষাদের সঙ্গে মিশে, বামুনের ছেলেটা বুনো ধাঙ্গড় হয়ে উঠ্‌ছে। ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে।" কিন্তু দেবীদাস নীরবে সেই সব কথা শুনিত, কারণ উত্তর দেওয়া তাহার স্বভাব নয়, উত্তর লওয়াই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে যে ভিতরে ভিতরে মানুষ হইতে কীট পতঙ্গ, এমন কি গাছ পাথরকেও কথা কহাইতে শিখিতেছিল, এ সংবাদ ত কেহই জানিত না!

সে দীন দরিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের সকলপ্রকার লোকের সহিত মন খুলিয়া মিশিত এবং কোন স্থানে কিছু শিক্ষণীয় পাইলেই তাহার মনের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা করিয়া ফেলিত। তাই গ্রামের দোকানদার উমা নন্দীর দোকানের কেনা বেচার গোপন রহস্যও তাহার অজ্ঞাত ছিলনা, কেলো গাড়োয়ানের দিন

মজুরী যে দিন যত হইত তাহার সংবাদও তাহার নিকট অপ্রয়োজনীয় ছিলনা; তাই ষষ্ঠী গোয়ালার কেলে গরুটা যে কেন সে দিন মরিয়া গেল তাহার কারণও তাহার নিকট তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া অনুভূত হয় নাই; কানাই কামারের ভিটা যে সেদিন জমিদারের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেল ইহার মর্ম্মভেদী দুঃখও সে অনুভব করিতে অক্ষম হয় নাই। এই কারণেই ধান্যাদির চাষের সকল রকম বিপদ সম্পদ, উপায় অনুপায়ও তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিলনা। এই কারণেই সে সে দিন মনু চামারের পিলে রোগা ছেলেটার জন্য চার ক্রোশ দূর হইতে ডিঃ গুপ্তের বোতল বগলে লইয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে গ্রামে ফিরিয়াছিল। এবং এই কারণে সে আপনাকে সকলের পক্ষে অধিগম্য করিয়া সকল প্রকার শিক্ষার পক্ষেও আপনার মনের দ্বার উদ্ঘাটিত রাখিতে পারিয়াছিল।

কথায় বলে যে চায় সেই পায়। কিন্তু এই চাওয়াটাই শক্ত। শাস্ত্রে বলে প্রাণ পণ ক'রে চাহিলে না পাওয়া যায় এমন জিনিষ নাই। তাই দেবীদাসের এই জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টাকে সাহায্য করিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য একজন বিজ্ঞ বন্ধুও জুটিয়া গেল। ইঁহার নাম হরিমোহন।

এই হরিমোহন বাবু একটু অদ্ভুত ধরণের লোক। তিনি নাকি পূর্ব্বে পশ্চিমের কোন এক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তারপর কলেজের কর্তৃপক্ষগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় কাজ ছাড়িয়া দিয়া এখন তাঁহার পৈত্রিক গ্রামে আসিয়া বাস

করিতেছেন। উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করার 'পর তিনি আর কোন চাকরীর চেষ্টা করেন নাই। কৃতবিদ্য হরিমোহন বাবুকে এইরূপে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু তাঁহাকে পুনরায় কোন কার্য্যের চেষ্টায় বাহির হইতে বারম্বার অনুরোধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি অচল অটল—পরের চাকরী আর তিনি করিবেন না। তিনি বলিতেন "আমার যাহা আছে তাহাও যদি আমার ও আমার মেয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয়, তাহলে রাজার রাজ্য পেলেও ভিক্ষুকের তৃষ্ণা মিটিবে না।" ফল কথা, তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা ভালই ছিল, তাই তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া একান্তে বসিয়া জ্ঞানালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু অন্যত্র দারপরিগ্রহ করেন নাই। একটী মাত্র কন্যা মনোরমা ছাড়া তাঁহার আপনার বলিতে সংসারে বড় একটা কেহ ছিল না। এই কন্যাকে আপন প্রজ্ঞামত শিক্ষিত করিয়া এবং স্বয়ং কলিকাতা হইতে পুস্তকাদি আনাইয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনে সময় কাটাইতেছিলেন।

আমাদের দেবীদাস হঠাৎ একদিন এই হরিমোহন বাবুর সুনজরে পড়িয়া গেল। স্বজাতীয় এই ব্রাহ্মণযুবকের সহিত দু একদিনের পরিচয়েই হরিমোহন বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, দেবীদাসের মধ্যে কত বড় একটা শক্তি কার্য্য করিতেছে; অথচ চালকের সুযোগের অভাবে এই শক্তি আশাহরূপ

ফল প্রসব করিতেছেনা। তাই তিনি ইহার শক্তির পূর্ণ বিকাশের ভার লইলেন।

সেই দিন হইতে প্রায় চার বৎসর ধরিয়া দেবীদাস ইঁহারই যত্নে নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিতেছে। তাহার ভ্রাতা কলিকাতায় ফুটবল, ক্রিকেট, কলেজ সভা, ক্লব্ এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়াও যাহা শিখিতে পারে নাই, দেবীদাস এই কয় বৎসরের মধ্যে তাহার অপেক্ষা অনেক শিখিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বোপরি তাহার শিক্ষিত বিদ্যাকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতা লাভ করাতে সে একটা পুরাপুরি মানুষ

হরিমোহন বাবু তাঁহার শিষ্যের উন্নতি দেখিয়া এবং সর্ব্বোপরি তাহার আন্তরিক মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া মনে মনে আরও একটা আশা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা আর কিছুই নয়, এই সাধুচরিত্র যুবকের সঙ্গে তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা মনোরমার বিবাহ দিয়া জীবনের শেষভাগ শান্তিতে কাটাইবার একটু সুখময় কল্পনা তাঁহাকে এখন পাইয়া বসিয়াছিল।

কন্যা মনোরমার ভাব দেখিয়া তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাতে তিনি তাঁহার এই কল্পনাকে অচিরকালের মধ্যে পূর্ণ হইতে দেখিবার আশা করিতেছিলেন। যদিও তাঁহার একমাত্র কন্যা বলিয়াই হউক বা তাঁহার বাল্যবিবাহে অনিচ্ছা থাকার দরুণই হউক, মনোরমার এখন পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, তথাপি

সাধারণ দৃষ্টিতে মনোরমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইবার মতই হইয়াছিল। কিন্তু দেবীদাসকে নিকটে পাইয়া এবং তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে তুলিতে ভাবী জামাতা রূপেই তাহাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেবীদাস কিন্তু এবিষয়ে তাহার শিক্ষকের মনোভাবের কথা এতাবৎ জানিতে পারে নাই। তাই মনোরমার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন না থাকিলেও মনোরমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আপনাকে যথাসম্ভব তাহার নিকট হইতে দূরে রাখিয়া চলিতেছিল। কিন্তু এ সব বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দৃষ্টিই অধিক প্রখর। তাই মনোরমা এই পিতৃশিষ্যের বিষয়ে তাহার পিতার মনের ভাব যেন কতকটা জানিতে পারিয়া অতি সহজে মনে মনে দেবীদাসকে পরমাত্মীয় ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। তাই দেবীদাসের কাছে তাহার কিছুই গোপন করিবার বা সঙ্কোচ অনুভব করিবার ছিল না।

উন্নতি

শিক্ষক মহাশয় দেবীদাসকে যে শিক্ষা দিতেন তাহার সঙ্গে কোন পুস্তকের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। মুখে মুখে গল্পের ছলে তিনি দেবীদাসের নিকট নানা বিষয় সম্বন্ধে আপনার মতামত প্রকাশ করিতেন। দেবীদাস তাঁহার আলোচনা

হইতেই শিক্ষালাভ করিত। অনেক বিষয় তাঁহার সহিত আলোচনার পর তাহার নিকট এত সহজ মনে হইত যে, সে বোধ করিত এতদিন তাহা যে বুঝিতে পারে নাই—ইহাই তাহার বুদ্ধির দোষ। সময়ে সময়ে তাহার সন্দেহও হইত, সে সত্যসত্যই কিছু জ্ঞান লাভ করিতেছে কিনা। কিন্তু যখন হরিমোহন বাবু কথোপকথনের পর সন্তোষ প্রকাশ করিতেন তখন তাহার সব সন্দেহই দূর হইত।

হরিমোহন বাবু দেবীদাসের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের স্বগ্রামের ও পরিচিত নিকটস্থিত গ্রামসমূহের লোকজন সম্বন্ধে, তাহাদের জাতি ও ধর্ম্ম, তাহাদের আর্থিক অবস্থা, কৃষিশিল্প, ব্যবসায়, সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ছড়া বচন, জনপ্রবাদ, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী ফকিরের মুখে গান, মেলা, উৎসব, পুরাতন মন্দির, দীঘি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। দেবীদাস এরূপে তাহার নিজগ্রাম ও নিকট-স্থিত গ্রামসমূহের সহিত বেশ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের পর দেবীদাস হরিমোহন বাবুর তত্ত্বাবধানে ক্রমশঃ পরগণা, জেলা ও প্রদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। দেশের বর্ত্তমান জনসমাজ, শিক্ষার ব্যবস্থা, কৃষিশিল্প, ব্যবসায় প্রণালী, সামাজিক অবস্থা, দেশের বিবিধ অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে করিতে যখন দেশটা তাহার নিকট সজীব বলিয়া বোধ হইত, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতর যখন সে একটা

প্রাণশক্তির প্রক্রিয়া অনুভব করিত, দেশ বা সমাজ যখন তাহার নিকট একটা অলীক ধারণা, একটা নীরস কল্পনা বোধ হইত না, তখন সে বর্ত্তমান ছাড়িয়া ধীরে ধীরে অতীতের রাজ্যে প্রবেশ লাভের অধিকার পাইল। হরিমোহন বাবু তাহাকে ইতিহাসের এক এক যুগ দেখাইয়া প্রত্যেক যুগের মহাপুরুষের জীবনীর মধ্য দিয়া, সে যুগের শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অতীতকে বর্ত্তমানের মত সজীব করিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিতে লাগিলেন।

এরূপে পরিচিত হইতে অপরিচিত, বর্ত্তমান হইতে অতীতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দেবীদাস অতীত ও বর্ত্তমান দুইএর ভিতর একটা চিন্তাস্রোতের অব্যাহত ধারা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিত। অতীত ও বর্ত্তমান যে সমসূত্রে গাঁথা রহিয়া মাঝে মাঝে অনুভব করিতে পারিয়া সে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিত।

দেবীদাস যে তাহার শিক্ষার এই ক্রমোন্নতির ধারা কিছু ধারণা করিতে পারিত তাহা নহে; সে আপনাকে হরিমোহন বাবুর নিকট একবারে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তিনি তাহাকে যাহা করিতে বলিতেন সে তাহা করিত। প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া সে হরিমোহন বাবুর নিকট আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, হরিমোহন বাবু তাহাকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছেন। তাঁহার সহিত দেবীদাসের শুধু একটা শিক্ষকের সম্বন্ধ ছিল তাহা নহে। হরিমোহন বাবু একাধারে তাহার শিক্ষক ও বন্ধু।

হরিমোহন বাবু প্রবীণ, তবুও দেবীদাসের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। দেবীদাসের শ্রদ্ধা ও প্রীতি একসঙ্গে মিশিয়া তাহার শিক্ষা ব্যাপারটিকে বেশ মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। অথচ দেবীদাস খুব কমই পড়িয়াছে। হরিমোহন বাবু তাঁহাকে মাঝে মাঝে তাঁহার সেল্‌ফ হইতে দুই একখান বই দাগ দিয়া দিতেন, তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন এবং সংক্ষিপ্তসারও বলিয়া দিতেন। হরিমোহন বাবু ভিন্ন আর কেহ দেবীদাসের শিক্ষার গতি ধারণাই করিতে পারিত না, অন্য লোকের মত দেবীদাসও আপনার সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিত না।

ভিক্ষুক না শিক্ষক

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া দেবীদাস হরিমোহন বাবুকে বলিল,"আজ দক্ষিণ পাড়ায় কেলো গাড়োয়ানের বাটীতে সকালে গিয়াছিলাম। একজন ফকির কি সুন্দর একটা গান করিল দেখুন। আমি তা লিখে এনেছি। ভাগ্যে আমার পকেটে একটা পেন্‌সিল ছিল, সেখানে একটা ছেঁড়া কাগজ পেয়ে তাড়াতাড়ি লিখে নিলুম। সেই হ'তে আমার পকেটেই গানটা রয়েছে। আমি ওটা পড়ছি—

"সমজে কর বণিজ কিয়া হায় ভারী।
কিসী নে লাঙ্গী লবঙ্গ এলাচী ; কিসী নে মিটা খারী।
যব সাঙ্গ ও নে মাঙ্গা লেখা, ভুলী সুদ সারী
হাম নে লাদা হায় নাম ধনীকা ; পুরাণ খেপ হামারী।
সমজে কর বণিজ কিয়া হায় ভারী॥"

(আমি চিন্তা করিয়াই খুব ভাল জিনিসের ব্যবসা লইয়াছি। কেউ লবঙ্গ কেউ এলাচ কিনিল ; কেউ কিনিল চিনি বা লবণ। যখন ভগবান্ তাহাদের নিকট হিসাব চাহিলেন, সকলেই সব ভুলিয়া গেল। আমি ভগবানের নাম কিনিয়াছি, আর আমার ভার পরিপূর্ণ। আমি খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাল ব্যবসায়ে ঢুকিয়াছি।)

"কেমন সুন্দর গান টা ; আপনার ভাল লাগ্ ছেনা ?"

"হাঁ খুব ভাল।"

"এ রকম ভিক্ষুক যে কত আছে তার ঠিক নেই ; এরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, আর এই সমস্ত খুব উঁচু ভাব গুলো প্রচার করে। আর দেখুন, আমার মনে হয়, এই গানটাতে একটা খুব বড় কথা এমন সহজ ও সোজাভাবে বলা হ'য়েছে, আমাদের আজকালকার বাঙ্গালা গানে তাহা পাওয়া যায় না। আপনার নিকট হ'তে যে কবিতার বই নিয়েছিলাম, তাতে অনেক রকম গান আছে ; কিন্তু সব গানগুলই এক রকম ভাসা ভাসা ; শুধু কথার বাঁধুনী, ভাব গুলো স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। তাই নয় ?"

"তুমি যা ব'লছ অত নহে। বুঝা যাবে না কেন ? কিন্তু

এটা ঠিক—এদের গানে ভাবগুলো যেরূপ সোজা ভাষায় সরল-ভাবে বলা হয় আজকালকার কবিদের লেখায় সেরূপ প্রায়ই পাওয়া যায় না। আর ভিক্ষুকেরা নিজে ত গান রচনা করে নি। অনেক দিনের গান। কোন সাধু সন্ন্যাসী ফকির মহা-পুরুষ হয় ত গানটা গেয়েছিল ; ক্রমশঃ সেটার প্রচার হয়েছে।"

"আচ্ছা, আপনি কি বলেন, এই ভিক্ষুকেরা কি আমাদের খুব ভাল করছে না? ঘরে ঘরে গিয়ে গান করে যায়, আর আমরা তাদের মোটে এক মুটা চাল দিই—তাতেই তারা সন্তুষ্ট।"

"তুমি দেখ্‌ছি খুব বাড়াবাড়ি কর! দেশে ভিক্ষুক সাজিয়া কত জুয়োচোর বদমায়েস লোক বেড়িয়ে বেড়ায়, তুমি তার খোঁজ রাখছ না, অনেক ভিক্ষুকই মিথ্যা করে ভিক্ষা করে ; তাদের ভিক্ষা দিলে জুয়াচুরীর প্রশ্রয় দেওয়া হয়।"

"দলের মধ্যে দুই চারি জন যদিও বদমায়েস হয়, তাহ'লে কি সকলেই দোষী, দলের ভাল কাজটা কি তখনও মন্দ বল্‌তে হবে? তা ছাড়া ভিক্ষুকগুলো দুষ্ট হ'ক না কেন, তারা কি তাদের কাজ করছে না, শুধু ঘরে ঘরে গান গাওয়া নয়, প্রত্যেক গৃহস্থকে সে দয়ালু হ'তে শিক্ষা দেয়। আমি একজন ভিক্ষুককে কিঞ্চিৎ চাল দিতে পারিলে আমার তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ইচ্ছা হয়। আমার তখন মনে হয়, আমাকে সে মানুষের সেবা করতে শিক্ষা দিয়া গেল। ভিক্ষুক যে আমার শিক্ষক।"

দেবীদাস বলিতে বলিতে একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল।

"তা ভাল, তোমার পক্ষে তা হ'লে সব ভিক্ষুক, ভাল হ'ক বা মন্দ হ'ক; শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু সকলের পক্ষে নয়।"

"কেন?" এখনও তাহার উত্তেজনা যায় নাই।

"আচ্ছা, ভিক্ষুককে তুমি যেমন সম্মান কর কেলো গাড়োয়ান সেরূপ করে কি? আজ তার বাড়ীতে যখন ভিক্ষুক এ'ল তখন কি দেখ্‌লে?"

"দেখলাম, তার স্ত্রী ফকিরকে এক মুঠা চাল দিল। তাদের মনের ভাব কি ছিল, আমি কি করে জান্‌ব?"

"কিন্তু ঐটিই আসল কথা। মনের ভাবের উপর একটা কাজের ভাল মন্দ নির্ভর করে। ভিক্ষা দিয়ে ভাল করলে কি মন্দ করলে, তা বুঝা যায়, তখনকার মনের ভাব হ'তে। আচ্ছা যাক্ সে সব কথা এখন। আর খবর কি বল। আজ সকালে কেলোর বাড়ীতে কি হ'ল?"

"কেলোর বাড়ী শুদ্ধ অসুখ, তার নিজের, তার মেয়ের, তার স্ত্রী সেরে উঠেছে।"

"কি অসুখ সকলের?"

"আবার কি—জ্বর—"

"তাই ত। এখন কেমন আছে তারা?"

"কেলোর বেশী জ্বর নাই, বোধ হয় দুই একদিনের মধ্যেই তার জ্বর ছাড়বে; কিন্তু তার মেয়ে সুধার খুব জ্বর হয়েছে।"

মনোরমা এতক্ষণ দেওয়ালের এক কোণে একটা মস্ত বড় চার্টের পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিতেছিল। কিন্তু তাহার

মন যে ইঁহাদের কথাবার্ত্তার দিকে ছিল না তাহা নহে। যখন দেবীদাস ও হরিমোহন বাবু দুইজনে খুব আলোচনা করিতেছিলেন, মনোরমা ভাবিতেছিল দেবীদাসের সহিত তাহার বাবার বুঝি ঝগড়া হইতেছে। সে জন্য সে একটুকু উদ্বিগ্নও হইয়াছিল। একবার সে মনে করিয়াছিল, সে তাহার পিতাকে বলিবে—আঃ বাবা, চুপ কর, দেবী বাবুকে রাগাচ্ছ কেন; কিন্তু তাহা বলিতে সাহস পায় নাই। যখন তাঁহাদের আলোচনা থামিয়াছে এবং তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তখন সে তাহার পিতার পাশে আসিয়া বসিল। সুধার অসুখ শুনিয়া সে দেবীদাসকে বলিল, "কোন্ সুধা, দেবী বাবু? সেই-ই আপনাদের বাড়ীর কাছে যে থাকে?"

"হাঁ, তুমি তাকে জান না?"

"জানি বৈ কি—সে দিন সেই-ই ত আমাকে আপনাদের বাড়ী হ'তে এখানে দিয়ে গেল—আপনি তখন ছিলেন না, আমি হৈমীর সঙ্গে সে দিন অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম।"

হরিমোহন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা হৈমীর সম্বন্ধে তুমি তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছিলে, তার কোন উত্তর এসেছে?"

"না, দাদা অনেক দিন চিঠি লেখেন নি; এবার তাঁহার পরীক্ষা, বোধ হয় খুব ব্যস্ত আছেন।"

"হৈমীর বিবাহের সম্বন্ধ আমিও করছি—"

মনোরমা বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া নতনেত্রে একটা কাগজ তাড়াতাড়ি উঠাইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার কপোল

রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে কিছুক্ষণের জন্য তাহার পিতার ও দেবীদাসের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে দেবীদাস ঘড়ি দেখিয়া উঠিয়া পড়িল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে। সে গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

হীনতার মহিমা

দেবীদাস রাস্তায় বাহির হইয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল। আমি যে হরিমোহন বাবুকে বলিয়া ফেলিলাম, ভিক্ষুকই আমার শিক্ষক, ইহা কি আমি হৃদয় হইতে বলিতে পারি? না, তর্কের জন্য একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের উপর আঘাত লাগিল বলিয়া ঐ কথাটা বলিলাম? ভিক্ষুক—তুমি দীন, হীন, পাপী, আমি কি তোমায় চিরকাল হৃদয়ের ভালবাসা ও অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়াছি? আমার অন্তর তোমাকে কি সাদরে বরণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে? আমি তোমাকে সেবাদান করিবার জন্য কি কাঙাল রহিয়াছি? কই সব সময়ে ত না? আমার মনে আছে, এক দিন আমি একজন কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত গলিতপদ ভিক্ষুককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহাকে উচিতমত অভ্যর্থনা করি নাই, তাড়াতাড়ি এক মুঠা চাল দিয়া তাহাকে যেন মনে মনে বলিয়াছিলাম, তুমি আমার সম্মুখে তোমার অপবিত্র পূতিগন্ধময় দেহ লইয়া আর দাঁড়াইও না, শীঘ্র যাও, দেরি করিও না। সে কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে নাই, এক মুঠা চাল

লইয়া আনন্দিতচিত্তে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল! আমি যাহাকে ঘৃণা করিয়াছিলাম সে আমাকে তার ভালবাসা জানাইতে দ্বিধা করিল না। আর এক দিনের কথা মনে হয়; মনে হইলে হৃদয়টা যেন কাঁপিয়া উঠে - এক ভিখারিণী বৈষ্ণবী সাজিয়া আমাদের ঘরের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার কদর্য্য মুখে যেন পাপের কালিমা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম— পাপের কি বীভৎসমূর্ত্তি, আমার শিরায় শিরায় যে শোণিত বহিতেছিল তাহা ক্ষণকাল যেন ভিখারিণীর অপবিত্রতা স্পর্শে বাধায় থামিয়া গিয়াছিল, আপনার আনন্দোল্লাস হারাইয়া গতি-হীন হইয়া আসিয়াছিল। আমি বোধ করিলাম দেহের রক্ত যেন জমাট হইয়া আসিতেছে, আমার হৃদয় যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, আমার কণ্ঠ কে যেন রোধ করিয়া দিতেছে। রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে হঠাৎ একটা চীৎকার বাহির হইল "যা—ও, এখানে হবে না।" ভিখারিণী চলিয়া গেল। প্রত্যাখ্যাতার কাতর চাহনি আমার হৃদয়কে তখন যেন কোন পীড়া দেয় নাই। কিন্তু আজ আমার মনে হইতেছে সে চাহনি কতকটা কাতরতা-ব্যঞ্জক ছিল, সে চাহনি আমি এখনও দেখিতেছি, আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে এই বুঝি তোমার হৃদয়, এই বুঝি তোমার ভালবাসা! উঃ আমি ত তাহাকে ভালবাসা দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়াছিলাম। এখন আমার ঘৃণাটা আমারই উপর ফিরিয়া আসিয়াছে—ধিক্ তোমায়। ভালকে কে না ভালবাসিতে পারে, মন্দ জঘন্যকে

তুমি ভালবাস নাই,—ধিক্ তোমায়, তোমার কপটতাতে ধিক্! না এই কপটতাকে জয় করিব; আমি কপট রহিব না। আমি তোমাকে ভালবাসিব। তোমার পাপ-কলঙ্কিত মুখকে আমি ভালবাসিব। কিন্তু তুমি বড় জঘন্য, তুমি বড় কদর্য্য, বড় বীভৎস! তোমার দিকে চাহিলে আমার শরীরটা যেন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। না—আমি প্রেম দিয়া তোমার কদর্য্যতাকে সুন্দর করিয়া দিব, তোমার বীভৎসতাকে কমনীয় করিব, তোমার জঘন্যতাকে পবিত্র করিয়া তুলিব। আমি তোমার হীনতাকে মহিমান্বিত করিব, তোমার কলঙ্ককে পুণ্যের গরিমায় অলঙ্কৃত করিয়া দিব। তুমি হীন তবুও তুমি আমার! তুমি পাপী, তাই আমার সমস্ত পুণ্যের দ্বারা তোমাকে বরণ করিব। তুমি পাপী যতদিন আমি পাপী। তোমার পাপ ততদিন, যতদিন আমার সঞ্চিত পুণ্য তোমাকে পবিত্র করিয়া না দেয়। আর হে আমার গলিতপদ ভিক্ষুক, তুমি আমার হৃদয়ে এস। আমি তোমার গলিতপদ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম, তোমার দেহের পূতিগন্ধ ঘ্রাণ করিয়া মুখ ফিরাইয়াছিলাম—আর তাহা করিব না, আমার করুণ-কোমল হস্তের স্পর্শ তোমার চরণের ক্ষতস্থানে চন্দন বিলেপন করিয়া দিবে, আমার প্রেম-পূত-হৃদয় তোমার পূতিগন্ধ দেহে নন্দন সুরভি ঢালিয়া দিবে। তবে ফিরিয়া এস, হে আমার প্রত্যাখ্যাত ভিখারী, এস আমার হৃদয়ে, হে আমার চিরবাঞ্ছিত, চিররোগ-তাপগ্রস্ত শাশ্বত-ভিখারী, আমার তৃষিত হৃদয় শীতল কর।

চাঁদ ও মেঘের এতক্ষণ খেলা হইতেছিল। চাঁদের কিরণ ও মেঘের অন্ধকারের লুকোচুরিতে এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি হইতেছিল। যখন মেঘ চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল তখন একবারে ঘোর অন্ধকার, অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গাছে গাছে, ঝোপে ঝোপে মিলিয়া এক প্রকাণ্ড বীভৎস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অসংখ্য জোনাকী পোকার আলোতে মুখব্যাদান করিয়া আসিতেছিল। দূরে শৃগালেরা প্রহর গণিতেছিল। শৃগালের রবে চকিত হইয়া কর্কশস্বরে পেচক ডাকিয়া উঠিল। মেঘ সরিয়া গেল। চন্দ্রকিরণ মেঘমুক্ত হইয়া হাসিয়া উঠিল। অন্ধকাররাশির বীভৎসতা স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। শুভ্র শান্তিতে চারিদিক্ ভরিয়া উঠিল। বনফুলের তীব্র গন্ধে বাতাসকে আমোদিত করিয়া তুলিল। দেবীদাসের কপালের স্বেদবিন্দু মুছিয়া লইয়া বাতাস তাহাকে চুম্বন করিয়া গেল। দেবীদাস চাঁদের দিকে চাহিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিল,—শুনিল, চাঁদ বলিতেছে, 'হে আমার চিরবাঞ্ছিত চিররোগপাপগ্রস্ত শাশ্বত ভিখারী, আমার তৃষিত হৃদয় তুমি শীতল কর!' তাহার হৃদয় শীতল হইল, চক্ষে জল আসিল।

আতঙ্ক

পরদিন প্রভাতে দেবীদাস যখন বাহিরের বারাণ্ডায় একটা চেয়ারে বসিয়াছিল তখন তাহার অন্তঃকরণ বেশ শান্ত ও প্রসন্ন। মনের ভিতরও ঝড় বৃষ্টি আছে। প্রবল ঝড় বৃষ্টির পর যেমন আলো ও বাতাস নির্ম্মল হয়, সেরূপ ভাবরাজ্যে আত্মগ্লানির ঝড় বাতাস ও ক্রন্দনের এক পশলা বৃষ্টির পর মনের ভাবগুলি বেশ শান্ত ও পবিত্র ভাব ধারণ করে। দেবীদাস এই শান্তি ও পবিত্রতায় উৎফুল্ল হইয়াছিল! সে যখন কেলোর বাড়ী যাইবার জন্য রাস্তায় নামিল তখন তাহার মুখের দিকে চাহিলে তাহার হৃদয়ের আনন্দ বুঝা যাইত।

"কি গো উমো খুড়ো, তোমার ক্ষেতে যেতে আজ এত দেরী হ'ল?"

"প্রণাম হই, ছোট বাবু; আজ দিনটা ভাল, দেরী কই, এমনি সময়ে রোজ হয়।"

দেরী কিছুই হয় নাই। উমো তাহার লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া দুটা বলদ লইয়া রোজই এই সময়ে ক্ষেতে কাজ করিতে যায়, তাহা দেবীদাস দেখে। কিন্তু আজ তাহার হৃদয় এত সহ ভালবাসায় পূর্ণ যে, সে উমাচরণকে একটা সাদর সম্ভাষণ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

দেবীদাস কেলোর বাটীর দরজায় পৌছিয়া হাঁক দিল,—

"কিরে ফেলো, কেমন আছিস্?"

"আসুন ছোট বাবু; আমরা দুজনে আপনার কথা কচ্ছিলাম।" কেলোর স্ত্রী একটি টুল আনিয়া দিল; দেবীদাস সেই টুলে বসিল। "আপনার মত লোক থাকলে গরীব দুঃখীর আর কোন ভাবনা নেই।"

"তোর জর সেরেছে? সুধা এখন কেমন আছিস?"

সুধা চৌকাটের নিকট বসিয়াছিল। তাহার শুষ্ক মুখের উপর দুই এক গাছা চুল পড়িতেছিল, সে তাহা সরাইয়া দিতেছিল। তাহার তখনও একটু জ্বর ছিল; তাই তাহার চক্ষুর সেরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টি ছিল না, একটু ম্লান ও বিবর্ণ দৃষ্টিতে সে দেবীদাসের পানে চাহিয়া বলিল, "আমার এখনও একটু জ্বর আছে বোধ হয়, আপনি দেখুন ত", বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিল।

"হাঁ, তোর জ্বর একবারে ছাড়ে নাই।"

"আমি কালকার চেয়ে খুব ভাল আছি; আজ ভাত খাব, পাঁচ দিন কিছু খাই নাই। কি বলুন, আজ আমি কি খাব?"

"তোর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তুই আজ ওপোস খাবি!"

"ওপোস খায় নাকি" বলিয়া সুধা হাসিয়া ফেলিল। দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুধার একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছিল। সে এমন সুন্দর যে কেহ তাহাকে দেখিলে মনে করিত এ ভদ্র ঘরের মেয়ে। নীচ ঘরে এমন মেয়ে কচিৎ দেখা যায়। উপ-

বাসের কঠোরতা সে সৌন্দর্য্যকে ম্লান করিতে পারে নাই—তাহার চাঞ্চল্যকে দূর করিয়া বরং সে সৌন্দর্য্যকে আরও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই হাসিতে তাহার স্বাভাবিক সরলতা প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু তবুও তাহার পূর্ব্বেকার মত মুখ উজ্জ্বল, তাহার চক্ষু লীলাচঞ্চল হইয়া উঠিল না।

দেবীদাসের অন্তরে একটা বিষাদের রেখাপাত হইল। সে যে সুধাকে রোজ দেখে—তাহার মাধুর্য্য তাহার চাঞ্চল্যে, তাহার স্বচ্ছ-সরল-হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি হর্ষোৎফুল্ল নেত্রযুগে প্রতিভাত হইত। তাহার সৌন্দর্য্যে সহিষ্ণুতার আভাস ছিল না,—তাহার সৌন্দর্য্য শরৎকালের নীলাকাশে স্বচ্ছন্দবিহারী ক্রীড়াশীল প্রভাত-অরুণিমাদীপ্ত স্বচ্ছ মেঘের মত—আষাঢ়ের পশ্চিম গগনের স্নিগ্ধ সান্ধ্য মেঘের মত ছিল না।

দেবীদাস সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া যখন ক্ষণকাল চিন্তা-বিমগ্ন হইয়াছিল, তখন কেলো তাহাকে বলিয়া উঠিল,—

"বাবু, ওর না হয় ব্যবস্থা করুলে। আমার কি হয়? আমার ঘরে ত আজ এক মুঠাও চাল নেই। টাকায় পাঁচ সের চাল—ধার করে কত দিন খাব? আপনি না দিলে ত হয় না।"

"তাতে আর লজ্জা কি? সুধার মাকে বল্ আমাদের বাড়ী গিয়ে হৈমীর কাছ হতে চাল এখনি গিয়ে আনুক। আমি থাকৃতে তুই শুকিয়ে থাকবি!"

কেলো তাহার স্ত্রীকে বলিল, "যা, হৈমী দিদির কাছে যা, চাল এনে তবে রান্না কর, বেলা হয়েছে।" কেলোর স্ত্রী চলিয়া গেল।

"দেখুন বাবু, আপনাকে একটা কথা এতদিন বলি নাই, আজ বলছি। আপনাকে বলাই ভাল।"

"কি বল্ না, কি এমন কথা?"

"হাঁ, এখনি বলি, সুধার মা গেল, কেউ শুনতে পাবে না, তাকেও এতদিন বলিনি, সুধা তুই ঘরে শোগে, আহা ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, যা মা বিছানায় শুয়ে পড়।" সুধা চলিয়া গেল। কেলো বলিতে লাগিল, "হাঁ, আপনাকে বল্‌ছিলাম কি, জমিদার বাবুর নায়েবের কাছ হতে তিন বছর হল ১০০৲ টাকা কর্জ্জ নিয়েছিলাম। তখন অসুখ ছিল, গাড়ী বইতে পারতাম না, আর একটা বলদ কিনিবারও দরকার ছিল। সুদে আসলে সে এখন ৩০০৲ টাকা হয়েছে। আমার ত ভয়ে পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়েছে—সুধার মাকেও একথা বলি নাই।"

"তাইত, আমাকেও ত আগে কিছু বলিস্ নি!"

"এতদিন নায়েব বাবু কোন তাগাদা দেন নাই, তবুও কি আমি নিশ্চিন্তি থাকতে পারি? এবার জ্বরের সময়ে সমস্ত রাত্রি রোজই স্বপ্ন দেখতুম, আমাকে যেন পেয়াদা এসে জেলে নিয়ে যাচ্ছে। সুধা যেতে দিচ্ছেনা, হাত ধরে টান্‌ছে, সুধার মা কান্নাকাটি করছে, আর পেয়াদারা আমাকে ছেঁচ্‌ড়াতে

ছিঁচ্‌ড়াতে গারদে নিয়ে চলছে। উঃ কি কষ্ট হচ্ছিল, তার পরে হ'ল, আপনি আমাকে জোর করে গারদের দরজা খুলে বের করে আনলেন। তাই আপনাকে বলছি।"

"ও সব মিথ্যা; স্বপ্ন কি কখন সত্যি হয়? ওতে ভয় পাস কেন?"

"না বাবু, বড় ভয় হয়।"

"সে থাক, তাহ'লে তুই টাকা শুধ্‌বি কি করে? আমাদের অবস্থাত জানিস্, দাদার কলকাতার খরচ যোগাতে সব যায়। বছর বছর চাল কিছু পাই, তা হ'তে এক রকম চলে।"

"বাবু, আপনাকে কি টাকা দিতে বল্‌ব—আমার মাথা আগে কাটুন তবে বল্‌তে পারি।"

"সেই স্বপ্নে আপনাকে দেখে অবধি আপনাকে কথাটা বলবার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই বললাম।"

"সুধার মা কি কিছুই জানে না?"

'না, তা'কে কিছুই বলিনি, যখন খুব জ্বর, তখন হঠাৎ বেঘোরে খুব চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলাম—'শোধ দোব যারিস্ নি'; তখন সে জিজ্ঞেস করেছিল, কি শোধ দেবে—কবে ধার শোধ দেবে? আমি তাও কিছু বলিনি। আপনি ত তার স্বভাব জানেন না, সে আমার সুখের ভাগী, কিন্তু দুঃখের ভাগী নয়, শুধু টাকা পয়সা পেলে খুসী থাকে—আর পেলেই খরচ করে, আমি কত বকি, তবুও শুনেনা! ও যদি ভাল সংসার করতে পারত, তবে এ দুঃখ হ'ত না।"

বলিয়া কেলোর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরক্ষণে একটু সাম্‌লাইয়া কেলো বলিল, "আমার সুধারও বুদ্ধি আছে, সেও বুঝে সুঝে, কিন্তু তার মা এতদিনেও বুঝ্‌ল না।"

সংসারের পথে

সন্ধ্যা হইয়াছে। দেবিদাস নানাস্থান ঘুরিয়া হরিমোহন বাবুর বৈঠকখানায় যাইয়া উপস্থিত হইল। দ্বারের নিকটেই মনোরমা দাঁড়াইয়াছিল, দেবী প্রবেশ করিতেই সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তোমার অপেক্ষা কর্‌ছিলাম দেবী দাদা, আমার সেই লেখাটা শেষ হয়েছে, দেখ্‌বে?"

"দেখ্‌ব, কিন্তু এখন নয়, আমার হাতে দিও আমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখ্‌ব। কাকার আহ্নিক হ'ল?" "না, আরও বোধ হয় আধ ঘণ্টা দেরী আছে, আজ ন' পাড়া হ'তে ঘুরে আসতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাই একটু দেরী করে উনি পূজার ঘরে ঢুকেছেন। বসনা, যাচ্ছ কেন?"

দেবিদাস ইতস্ততঃ করিয়া শেষে একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল। এরূপ ভাবে মনোরমার নিকট বসিয়া, একদিকে তাহার কেমন লজ্জা বোধ হইতেছিল। কারণ মনোরমার এখন বয়স হইয়াছে,—ভরা ভাদ্রের নদীর ন্যায় তাহার সুপুষ্ট নিটোল দেহ এখন সৌন্দর্য্য ও লালিত্যে ভরিয়া

উঠিতেছে। তদুপরি তাহার পিতার শিক্ষা ও তাহার অন্তরের গূঢ় পবিত্রতা তাহার সমস্ত মুখখানির উপর এমন একটা শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে যে, যে তাহাকে দেখিত সেই ক্ষণকালের মধ্যে অভিভূত হইত। দেবিদাসও সেইজন্য মনোরমার শক্তি এখন অনুভব করিত। কিন্তু পাছে সে বেশী অভিভূত হইয়া পড়ে এবং পাছে তাহার গুরুর বিশ্বাসের অপব্যবহার করা হয় এই ভয়ে সে আপনাকে পূর্ণভাবে মনোরমার নিকট ধরা দিতে পারে নাই।

দেবিদাসকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মনোরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আজকাল তুমি এত কি ভাব, দেবী দা? রাত দিন মুখ ভার করেই আছ। কি হয়েছে তোমার?"

দেবিদাস বলিল, "ভাব্‌ব আবার কি? কিছুই না।"

মনো। "মিছে কথা, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। আমায় বল্‌বেনা?"

দেবিদাস। বলবার মত কিছুই হয় নি, তবে হৈমীর বিয়ে দেবার জন্য বড়দিদি তাড়া দিচ্ছেন অথচ হাতে একটিও পয়সা নেই, কি দিয়ে কি কর্‌ব বুঝতে পারছিনা।

মনো। তা এর জন্য তোমার এত ভাবনা কেন? হরিদাদা রয়েছেন, বাবা রয়েছেন, ওঁরাই ভাব্‌বেন। তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে আপন্ কাজ করে যাও।

দেবিদাস। তা হয়না মনু, দাদা পড়াশুনা করছেন। ওঁর উপরেই আমাদের সব আশা ভরসা। ওঁকে এসব কথা

বসে ব্যস্ত করতে পারি নে। আমি যখন এখানকার সব ভার নিয়েছি তখন আমাকেই সব করতে হবে।

মনো। তিনি বড়, ভার তাঁর হলনা, হ'ল তোমার? এ ভারী অন্যায়। তিনি পড়াশুনা করবেন, কলকাতায় থেকে হাওয়া দিয়ে—

দেবিদাস। কিছু অন্যায় করছেন না মনু, তুমি মিছি মিছি তাঁর উপর রাগ করছ। তাঁকেই এর পরে সব ভার বইতে হবে; তাই এখন তাঁকে একটু নিশ্চিন্দি হয়ে পড়া শুনা করতে হচ্ছে।

মনো। মা দেবী-দা আমার ভারী রাগ হয়, তিনি বড় তুমি ছোট; তিনি কোথায় তোমাদের যাতে কষ্ট কম হয় তাই করবেন, তা নয় বছর বছর একজামিনে ফেল হচ্ছেন, আর তোমাদের এই অল্প টাকার ওপর আরো টানাটানি বাড়িয়ে দিয়ে সখের পড়া পড়ছেন। তুমি সারাদিন রোদে মাঠে মাঠে ঘুরে চাল ধানের সংস্থান করছ আর তাঁর বাবুগিরির অন্ত নেই। বিশ্বম্ভর বাবুর সঙ্গে মিশে—

দেবিদাস ব্যথিত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "মনু আমার সাক্ষাতে আমার দাদার নিন্দে করোনা। গুরুজনের নিন্দেয় পাপ হয়। তোমারও তিনি দাদা।"

মনোরমা এই তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া চুপ করিল, এবং তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া দেবীদাস ব্যথিত হইয়া বলিল, "মনু, তুমি আমার

দিকটাই ক্রমাগত দেখতে, তাই অন্য দিকটার দিকে তাকাও নি। সবাই ত এককাজের জন্য তৈরী হয়নি, আমি এই সব পারি তাই ভগবান্ আমায় তাতেই লাগিয়েছেন। এর জন্য দুঃখ্ করা বৃথা। আমার কথায় রাগ ক'রনা।"

দেবিদাসের কথায় মনোরমার অভিমান আরও উথলিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপনের চেষ্টা করিল বটে কিন্তু দেবিদাস তাহা দেখিতে পাইয়া কাতরভাবে বলিল, "ক্ষমা কর মনু, আমার দোষ হয়েছে, আর তোমায় বক্‌বনা। তুমি রাগ করলে আমার মর্মান্তিক হবে।"

ইত্যবসরে হরিমোহন বাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"কি হচ্ছে তোমাদের ?"

দেবিদাস হাসিয়া বলিল, "আমি একটু বকিছি বলে মনু আমার ওপর রাগ করেছে।"

মনোরমা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কখন রাগ কর্‌লাম ? না, বাবা, আমি রাগ করিনি। দেবী দা, আমারই অন্যায় হয়েছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

হরিমোহন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বাস্ শোধ বোধ হয়ে গেল ? এখন ব্যাপারটি কি ? কি নিয়ে রাগারাগি চলছে ?"

দেবিদাস। মনু বলছিল,—

মনো। আমি বলছি তুমি থাম। বাবা বলুন ত, এতে আমার কি এমন দোষ হয়েছে ?

হরিমোহন। এই যে তুমি এখনি স্বীকার করেছ যে তোমারই দোষ হয়েছে?

মনো। নইলে দেবী দা রেগে থাকত। কিন্তু ও কথা যাক এখন শুনুন।

মনোরমা তাহাদের সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া শেষে বলিল, "এতে আমার এত কি দোষ হয়েছে যে দেবী দা আমায় অত বকলে?"

হরিমোহন। তোমার দোষ হয়েছে এই যে, তুমি একজনের দিক্ নিয়ে আর একজনের বিচার করেছ। দেবিদাসের কষ্ট হচ্চে বলে তুমি হরিদাসের ওপর রাগ করছ, কিন্তু হরির দিক্ থেকে দেখলে তার অত দোষ দেখতে পেতে না। সে এখন এতদূর এগিয়ে পড়েছে যে, এখন যদি সব ছেড়ে ছুড়ে এখানে এসে বসে, তাহ'লে তার একূল ওকূল দু-কূলই যাবে। তাই তাকে যেমন করেই হ'ক পাস করতেই হবে, তা সে যতবারই ফেল হ'ক। আর দেবি, তোমারও একটু ভুল হয়েছিল যে, তুমি মনুর কথায় অতটা বিচলিত হয়েছিলে। স্নেহের বিচার কখনই ঠিক হয় না, তাই বলে স্নেহটাকে অমান্য করলে ত চলবে না। থাক্ তোমাদের গোলমাল ত থেমে গেছে, এখন আজকের কি খবর বল?

তারপর নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেবিদাস্ সে দিনের মত বাড়ী যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। মনোরমা তৎপূর্ব্বেই কক্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। দেবিদাস

হরিমোহন বাবুর বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া তাঁহার উদ্যানের গেটের কাছে পৌঁছিয়াই চমকিয়া উঠিল। দেখিল মনোরমা গেটের নিকটে দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কভাবে কি দেখিতেছে। চন্দ্রালোকে সমস্ত জগৎ তখন উদ্ভাসিত। দেবিদাস দেখিল, নিস্তব্ধ রাত্রের সুপ্ত শান্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে ঐ একটী মাত্র অসুপ্ত বালিকা দাঁড়াইয়া সমস্ত সুপ্তিকে যেন একটা গভীর ও মধুর জাগরণে জাগাইয়া রাখিয়াছে। মনোরমাকে কোন দিন এমন এককভাবে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে সে দেখে নাই। কিন্তু আজিকার এই শুভ্র জ্যোৎস্নার লোভ যে এই তরুণীও সম্বরণ করিতে পারে নাই এই কথাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমাগতই তাহাকে নেশার মত আক্রমণ করিতে লাগিল। তথাপি সে পাছে মনোরমার ধ্যানভঙ্গ করিয়া ফেলে এই ভয়ে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু গেটের নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মনোরমা ফিরিয়া বসিল, "দেবী দা, আমার ওপর আর তোমার রাগ নেইত? আমায় ক্ষমা করেছ ত?"

এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায়, এমন শান্তির মধ্যে, এমন মৌন-মুগ্ধ আকাশের তলে সে রাগ করিয়া থাকিবে? আর সেই কথা সে স্মরণ করিয়া রাখিবে? দেবিদাসকে মনোরমার কথাগুলা যেন মারিল, তাই সে পলাইতে পলাইতে বলিল "না—মনু না।" দেবীর স্বরে যে কাতরতা ছিল তাহা যেন তখনকার সমস্ত মূক প্রকৃতির হৃদয়ের কথা। যেন নিস্তব্ধ রাত্রির গোপন

আত্মাটা অতিদূর হইতে ক্ষীণ কাতরস্বরে জানাইয়া দিল—না—এ সময় রাগ নাই, অভিমান নাই, কিছুই নাই। যা আছে তা প্রকাশের নয়, কেবল অনুভবের।

"না, মনু, না।" দেবিদাসের নিজের কথা কয়টি নিজের কানে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার সমস্ত দেহ মন কম্পিত হইয়া উঠিল, এবং সেই সঙ্গে ঐ একটী ক্ষমাপ্রার্থী হৃদয়ের সমস্ত মধুরস তাহাকে এমনিভাবে মাতাল করিয়া তুলিল যে সে কিছুতেই থামিতে পারিল না। চন্দ্রালোকে ক্রমাগতই সে তাহাদের গ্রামের জনহীন পথে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

তাহার মনে আজ যে ভাবগুলি ক্রমাগতই উঠিতে লাগিল তাহা তাহার পক্ষে নিতান্তই নূতন। যদিও তাহার চিত্ত স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ তথাপি তাহার চিত্তাকাশে অভাব ধূমাবতী দেবীর কুলার শব্দের সঙ্গে মাতা সরস্বতীর বীণার মধুরধ্বনি মিশিয়া এক অদ্ভুত ঐক্যহীন কর্কশধ্বনি তাহার প্রাণে জাগিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে আজ এ অচেনা বাঁশী তাহার মন যমুনার শুষ্কতট ভাবের জলোচ্ছ্বাসে ছাপাইয়া ভাসাইয়া বাজিয়া উঠিল। সে যে ইহার জন্য কখনই প্রস্তুত হয় নাই। না—না সে তো ইহাকে চাহেনা, চাহিতে পারেনা। সে যে এতদিন কালের কর্ম্মরাজ্যের শিঙাধ্বনি শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। হঠাৎ এ কে আসিয়া সমস্ত ওলট পালট করিয়া দিতে চাহিতেছে? কে তুমি?—

দেবিদাস আর ভাবিতে পারিল না। গ্রাম হইতে সে বাহিরে আসিয়া প্রান্তরের মধ্যে একটা আইলের উপর বসিয়া পড়িল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই একটা নিশাচর পক্ষীর শব্দে তাহার ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল। মনে পড়িল তাহার বোন, তাহারই অপেক্ষায় ভাত কোলে করিয়া বসিয়া আছে। অমনি সে দ্রুতবেগে গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিল।

গরীবের ভিটা

কেলো সারিয়া উঠিল, খুব ঘন ঘন গাড়ী বহিতে লাগিল, কিন্তু তাহার ঋণ পরিশোধ হইল না। তাহার স্ত্রীর হাতে যাহা সে রোজ আনিয়া দেয় তাহা সে খরচ করিয়া ফেলে, হয় মাছ না হয় গুড় সন্দেশ, না হয় জামা কাপড়, সে একটা না একটা কিছু কিনিবেই। কেলো কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না; শেষে সে অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া একটু নিশ্চিন্ত হয়। হিন্দুর নিকট অদৃষ্টই সর্ব্ব দুঃখহর—সর্ব্ব যন্ত্রণাপ্রশমন, অদৃষ্টের কোমল ক্রোড়ে হিন্দু একবার আশ্রয় লইতে পারিলে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যায়। কেলো ও তাহার সব দুঃখ ভুলিয়া গেল, ভবিষ্যতের জন্য কোন চিন্তা তাহার রহিল না। কিছু দিন এই ভাবে চলিল।

টাকায় ছয় সের চাল ছিল, তাহা ক্রমে টাকায় পাঁচ সের হইল! এবার কাঞ্চনতলা গ্রামে দুর্ভিক্ষের প্রকোপটা পূর্ব্ব হইতেই দেখা গিয়াছে। কেলো তাহার গাড়ী আর চালাইতে পারিল না। গাড়ীর আরোহী কোথায়? পেট ভরিলে তবে তো লোকে একটু আরাম করিবার সুবিধা পায়। তিনটা বলদকে কেলো আস্তে আস্তে বেচিয়া ফেলিবে স্থির করিল, ঘরে বসাইয়া খাওয়াইতে তাহার সামর্থ্য ছিল না। মনে করিয়াছিল বলদ তিনটা বেচিয়া সে নায়েব বাবুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। কিন্তু বলদ গুলাকে সে সময় মত বেচিতে পারিল না, গ্রামের কেহই তাহার বলদ লইল না। তাহাদের ঐ সময়ে বলদের প্রয়োজন ছিল না, কাজেই কেলো বলদ তিনটাকে তিন ক্রোশ হাঁটাইয়া লইয়া কৃষ্ণপুরের হাটে বিক্রয় করিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর হাতে ৫০৲ টাকা দিয়া তাহাকে বলিল "দেখিস টাকা খরচ করিসনি; টাকার খুব দরকার হবে, দুর্ভিক্ষে কি হয় কে জানে।"

এখনও তাহার স্ত্রী নায়েবের নিকট তাহাদের ঋণের কথা কিছুই জানে না।

শেষে একদিন কেলো তাহার স্ত্রীর নিকট চাবি চাহিয়া বাক্স হইতে ৫০৲ টাকা গুনিয়া লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেলো নায়েব বাবুর নিকট কাছারী বাড়ী গেল। গ্রামের

এক পাশে থানা ও কাছারী বাড়ী। কাছারী বাড়ীর চারিদিকে খুব উঁচু মাটীর প্রাচীর। প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দরজা। প্রাঙ্গণের দুই ধারে চাঁপা ফুলের গাছ। লাউ গাছ একদিকে বাঁশ বহিয়া প্রাচীর ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে একটা ঘর, ঘরটা খুব উঁচু, তাহার দেওয়াল ইটের, ও ছাউনি খড়ের। ঐ ঘরের সম্মুখে একটা বারাণ্ডায় একটী জল চৌকিতে বসিয়া নায়েব বাবু ধূম পান করিতেছিলেন।

কেলো বাঁধান ধাপ দিয়া ঐ বারাণ্ডায় উঠিল ও মাথা মাটীতে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। নায়েব বাবু একবার বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আর একদিকে ধূম ছাড়িয়া দিলেন। কেলো একটু পরে বারাণ্ডার একটা বাঁশের খুঁটির পাশে বসিল।

নায়েব বাবু দেখিতে কিছু স্থূল, শ্যামবর্ণ, নাসিকা সুগোল, ভ্রূযুগ্ম কুঞ্চিত, তাঁহার কণ্ঠে তুলসীর মালা। তাঁহার নাম শ্যামাচরণ ঘোষ। জাতিতে তিনি সদ্গোপ। তামাক টানিতে টানিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেলোর হৃদয়কে কম্পিত করিয়া তিনি বলিলেন, "তোর মতলব কিরে কেলো? টাকা দেওয়ার কথাটা কি একবারে ভুলে গেছিস? টাকা এনেছিস?"

কেলো কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, কিছু টাকা এনেছি।"

'কত টাকা?"

"এখন ৫০৲ তারপর—"

"উঃ খুব এনেছিস, আমাকে রাজা করে দিলি। সে সব হবে না, সব টাকা এখনি বের কর্, না হলে"——

কেলোর মুখ শুকাইয়া গেল, গলা কাঠ হইয়া গেল, তবু দুই তিনটা ঢোক গিলিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "দোহাই নায়েব মশায়, আপনি গরীবের মা বাপ, গরীবের ভিটাটা রক্ষা করুন।"

"ওসব কথা রাখ, এখন কবে টাকা দিবি বল্।" "মশায়, এবার পঞ্চাশ টাকা নিয়ে রেহাই দেন, আর চারমাস পরে সব টাকা দিতে পারব।"

নায়েব মশায় একটা অবিশ্বাসব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে দে এখন যা এনেছিস; কিন্তু বাকী টাকা চার মাসের মধ্যে যদি সব শোধ না করিস তবে তোর ভিটা মাটী উচ্ছন্ন যাবে বলে রাখলাম। বেটারা বড় পাজী, যত এদের দয়া করা যায় তত এরা মজা পায়।"

"আপনিই এখন আমাদের রাজা, রাজা বাবু ত কলকাতায় থাকেন, আপনাকেই আমরা রাজা বলে জানি; আপনি দয়া না করলে আমরা যাব কোথায়?"

কেলো ৫০৲ টাকা গুনিয়া মাটিতে রাখিল। শ্যামাচরণ—"ওরে বিশু, টাকাটা জমা কর্" বলিয়া একটা হাঁক দিলেন।

কেলো প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তাহার টাকাটা খাতায় জমা হইল কি না দেখিয়া গেল না।

ছায়াতপ

কেলো যখন তাহার কুটীরে ফিরিয়া আসিল তখন সেখানে একটা গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে।

কেলোর স্ত্রী তাহার বাক্সে চাবি লাগান রহিয়াছে দেখিয়া ও বাক্সের ভিতরে টাকা না পাইয়া ভাবিয়াছে, টাকা চুরি গিয়াছে। সে এতক্ষণ মাঠে যাইয়া ঘুঁটে রোদে দিতেছিল; ঘরে ছিল একমাত্র সুধা। সুধাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, ঘরে কেহই আসে নাই।

কেলো কখনও তাহার স্ত্রীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন টাকা নিজে খরচ করিত না; তাহার স্ত্রী কিন্তু ব্যয় বিষয়ে স্বামীর মতামতের অপেক্ষা করিত না। সুতরাং কেলো যখন তাহার স্ত্রীর মত না লইয়া টাকা লইবে না, সে সাব্যস্ত করিয়াছে টাকা চুরি গিয়াছে, এবং এই চুরির একমাত্র কারণ তাহার স্বামীর অসাবধানতা। এই মনে করিয়া সে স্বামীকে খুব ভৎসনা করিতেছিল, এমন সময় কেলো কুটীরে প্রবেশ করিল।

"বাক্সের টাকা কি হল?"

"আমি টাকা দিয়ে এসেছি।"

"সব টাকা—এত টাকা কাকে দিয়ে এলে?"

"দিয়ে এসেছি কাকে তা জেনে তোমার দরকার নেই।"

"সব টাকা দিলে, আমরা তা হলে খাব কি ?"

"তা আমি কি করব, কোন রকমে চালাতেই হবে।"

কেলোর স্ত্রী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "অতগুলো টাকা নষ্ট করে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এলে। আর আমরা কি শুকিয়ে মরব ?"

"আমি জানি কাকে টাকা দিয়েছ।"

কেলো রক্তবর্ণ মুখে চোখ কপালে তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কাকে টাকা দিয়েছি শুনি ?"

"বদমায়িশি বদ খেয়ালি করে, আবার চোখরাঙ্গানি !"

কেলোর ওষ্ঠদ্বয় নড়িয়া উঠিল, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল, রাগে সে কাঁপিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী ও কন্যা তাহার এ মূর্ত্তি কখন দেখে নাই। তাহার এরূপ বিকৃত কণ্ঠও কখন শুনে নাই।

"আমি বদখেয়ালি করেছি, এত বড় তোর আস্পর্দ্ধা"— বলিয়া সে স্ত্রীর হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল।

স্ত্রী সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া পিছাইয়া গেল এবং এক গাছা কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িল। সুধা এতক্ষণ পশ্চাতে থাকিয়া সব দেখিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি পিতার সম্মুখে আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিল।

"ছি বাবা থাম—মেরো না তোমার পায়ে পড়ি থাম।"

কেলো থামিয়া গেল এবং তাহার ক্রোধ দমন করিতে চেষ্টা করিল।

কেলোর স্ত্রী দূরে সরিয়া গিয়া "ছাড় হাবাতে মিনসে, তোর এত তেজ, আমি এবার তোর তেজ বের করছি" বলিয়া অকথ্য ভাষায় তাহার উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল।

কেলো তখন ঘর ছাড়িয়া দাওয়ার এক পাশে যাইয়া বসিয়াছে, নিকটে এক ঘটী জল রাখা ছিল, "সুধা, আমাকে তামাক দে ত" বলিয়া সে ঘটী লইয়া হাত পা ধুইতে লাগিল; সুধা খুব তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া দিল। ধূমপান করিতে করিতে কেলোর স্বভাবসুলভ শান্ত ও প্রসন্ন মুখ ফিরিয়া আসিল। সে মনে মনে তখন সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। "সুধা মা আজ আমাকে মহাপাতক হতে রক্ষা করেছে।" কেলো সুধাকে সম্মুখে আসিতে বলিল।

"আয় মা বোস্।" সুধা তাহার পদতলে বসিল। কেলো উহার চিবুক হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল।

সুধা ইতিমধ্যে তাহার মাকে ঠাণ্ডা করিতে একবার ঘরে গিয়াছিল; তাহার তাড়া খাইয়া চক্ষু ছল ছল করিয়া সে পিতার সম্মুখে আসিয়াছিল। পিতার এক্ষণে স্নেহ-চুম্বন পাইয়া সে আর চোখের জল রোধ করিতে পারিল না, অঞ্চল দিয়া মুছিতে লাগিল।

"কাঁদিস নি মা, ওর স্বভাবই এমনি; এতদিনে জানলি নি।"

হাটের পথে

কেলো তাহার বলদ বেচিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার গাড়ী বেচিতে পারিল না, কেহই তাহা লইল না। এখন সে দিন মজুরী করিয়া খায়। নায়েব বাবু জমিদার মহাশয়ের হুকুম মত একটা মস্ত বড় ইঁদারা খনন করাইতেছিলেন। নায়েব বাবুকে বলিয়া কহিয়া সে রাজমিস্ত্রীদের নিকট মজুরের কাজ পাইয়াছে। সমস্ত দিন ইট কুটিয়া বা ইট বহিয়া সে বারটী পয়সা পায়।

কেলোর স্ত্রী মাঠে মাঠে যাইয়া গোবর কুড়াইয়া আনে, গোবর রোদে দিয়া সে ঘুঁটে করে। তাহাদের কুটীরের আঙ্গিনায় সময়োপযোগী শশা, শাক, কুমড়া প্রভৃতিও হয়। হাটের পূর্ব্বের দিন অপরাহ্নে সুধা শাক প্রভৃতি তুলিয়া রাখিত। হাটের দিন খুব প্রত্যূষে উঠিয়া মাতা ও কন্যা হাটে যাইত।

মাতার মাথায় ঘুঁটের ঝাঁকা ও কন্যার কোমরে ফসলের একটা ছোট ধামা। যে দিন হাট বসিত তাহার পূর্ব্ব দিন রাত্রে ভাত ও একটা শাক রাঁধিয়া রাখিত। কেলো প্রত্যহ অপরাহ্নে ফিরিত, হাটের দিনে সে নিজে খাইয়া স্ত্রী ও কন্যার শাক ভাত ঢাকিয়া রাখিত। তাহারা সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আহার করিত। যে দিন হাট বসে না সে দিন তাহারা তিন জনেই একসঙ্গে অপরাহ্ন-সময়ে আহারে বসিত।

কয়েক মাস এই প্রকারে চলিল। কেলো প্রত্যহ বার পয়সা আনে; তাহার স্ত্রী ও কন্যা হাটে ঘুঁটে ও শাক কুমড়া বিক্রয় করিয়া কিছু পায়, এরূপে তাহারা কোন প্রকারে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে লাগিল। এখনও কতদিন যে এ প্রকারে কাটাইতে হইবে তাহার ঠিকানা নাই, ইহা অপেক্ষা যে দুর্দ্দিন আসিবে না তাহারও ঠিক নাই।

কিন্তু এ সব কেলো ভাবিত, সুধা ও সুধার মার দুই জনেরই এ সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ ছিল না। সুধা এতদিন কখনও হাটে পথে সদর রাস্তায় ঘুরে বেশী যাওয়া আসা করে নাই। সে এই স্বাধীনতা লাভ করিয়া মনে মনে বরং একটু আনন্দ পাইয়াছিল।

সুন্দর স্বাস্থ্য ও যৌবনের সৌন্দর্য্য লইয়া যখন সে মার সহিত হাটে যাইত, তখন পথের লোক, পথের পাশে গৃহদ্বারে উপবিষ্ট নিষ্কর্ম্মা ভদ্র সন্তানও কেন তাহার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিত তাহা সে বুঝিতে পারিত না। তাহা ছাড়া তাহাদের হাটের পথে এক জন সঙ্গী ছিল; তাহার নাম সিধু। সিধু গ্রামের প্রান্তভাগে মাঠের ধারে বাস করিত, তাহাদের ঘরটী গ্রামের শেষ সীমানায়। ঘরের পশ্চিমেই মস্ত বড় মাঠ, সেই মাঠের উপর দিয়া বাবলা গাছের পাশ দিয়া হাটের পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। সিধুর কুটীর হইতে দুই ক্রোশ রাস্তা হাটিলে তবে কৃষ্ণপুরের হাটে পৌছান যায়। সিধু এক দিন তাহার কুটীর হইতে হাটে যাইবার জন্য

বাহির হইতেছে, এমন সময়ে দেখিল সুধা ও তাহার মা তাহাদের আপনাপন ভার লইয়া তাহার কুটীরের সামনের রাস্তা দিয়া মাঠে নামিতেছে।

"তোমরা কোথায় যাবে গা, হাটে যাচ্ছ?"

সুধা বলিল—"হাঁ আমরা হাটে যাচ্ছি, না হলে আমাদের এই সব জিনিষ কি হবে?"

সিধু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তা বটে, তোমরা কোন্ গাঁয়ের?"

"আমরা এই গাঁয়েরই, দক্ষিণ পাড়ায় আমাদের ঘর।"

"বেশ চল; আমিও হাটে যাচ্ছি।"

সুধার মা বলিল "তা বাছা ভালই হল, এক সঙ্গে বেচা কেনা করে ফিরে আসব।"

সিধুর সঙ্গে ইহাই তাহাদের প্রথম পরিচয়। সেই হইতে সিধু রোজই তাহাদের সঙ্গে হাটে যায় ও হাট হইতে ফিরিয়া আসে। সুধা ও তাহার মা তাহাকে রাস্তা হইতে ডাক দেয়, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের সঙ্গ লয়। হাটে যাইয়া সিধু তাহাদের বিক্রয়েরও খুব সুবিধা করিয়া দেয়। সিধু বেশ পাকা বিক্রেতা। ঘুঁটের দাম লইয়া দর কষাকষি হয় না, হাটে ঘুঁটের এক দাম, পয়সায় সাত গণ্ডা। কিন্তু শাক শবজী কুমড়া শশা লইয়া খুব দর করিতে হয়। সুধা ও সুধার মা যখন তাহাদের ফসল সম্বন্ধে ক্রেতাদিগের অমনোযোগিতা দেখিয়া সস্তায় বিক্রয় করিতে উৎসুক হয়, তখন সিধু তাহা-

দের ঔৎসুক্য নিবারণ করে এবং দর ঠিক রাখিতে উপদেশ দেয়। শেষে সেই দরেই তাহারা বা অন্য লোক আসিয়া ক্রয় করিয়া লয়। এই উপায়ে সিধু প্রত্যহই তাহাদের বিক্রয় কাজে সাহায্য করে।

সুধা ও তাহার মা দুই জনেই তাহার সহানুভূতিপ্রণোদিত কার্য্যের জন্য তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করে না।

দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এরূপ পরস্পরের সহানুভূতি ও উপকার সাধন বিরল নহে। কৃতজ্ঞতা জানাইবার কারণ তাই বিরল।

সহানুভূতি

সিধুর ভাল নাম সিদ্ধেশ্বর, তাহার পিতা রমণ ঘোষের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তাহাদের পঁচিশ বিঘা জমি চাষ ছিল। তাহাতে যে ফসল পাইত, খাজনা খরচ বাদ দিয়াও তাহাতে তাহাদের বেশ ভরণপোষণ হইত। কিন্তু এই দুই বৎসর অজন্মা হওয়ায় তাহাদের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর গত আশ্বিন মাসে সপ্তমী পূজার দিনে যখন আগমনী গানে ও ঢাক ঢোলের শানাইয়ের শব্দের সহিত গ্রামের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে উৎসবের আনন্দ ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তখন তাহার পিতা তিন চারি মাস ম্যালেরিয়

রোগে ভুগিয়া রোগের হাত হইতে এ জন্মের মত এড়াইল। এখন তাহার আপনার বলিতে মা ভিন্ন কেহ নাই। স্বামীর মৃত্যু ও পুত্রের সংসার নির্ব্বাহের কষ্ট দেখিয়া সিধুর মা শয্যার আশ্রয় লইল। প্রথমে সে শয্যা ছাড়ে নাই, এখন শয্যা তাহাকে ছাড়িতেছে না। তাহাদের গোশালায় পূর্ব্বে দুইটী বলদ, একটী গাভী ও একটী বৎস ছিল। এখন নিজের গৃহস্থালী চালানর ভার অনুভব করাতে সিধু গরু বলদ বেচিয়া ফেলিয়াছে। এখন রুগ্ন মাতার পথ্য কোন রকমে দিতে পারিলেই সে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করে।

একদিন প্রাতঃকালে সিধু তাহার মাতার শয্যার পাশে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বাহির হইতে সুধার মা ডাক দিল। "সিধু, হাটে যাবিনি—আয়।"

তাহার মাতা বলিল, "কে ডাক্‌ছে বাইরে হতে, ভিতরে ডাক্ না।"

"ওরা দক্ষিণপাড়ার, যাদের কথা তোমাকে বলছিলাম, এক সঙ্গে আমরা হাট করি। আমি ওদের ডেকে আনি।"

একটু পরেই সিধু সুধার মাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সুধা পিছনে ছিল।

সিধুর মা তাহাদের দেখিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু রোগে অনাহারে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার চেষ্টা বৃথা হইল।

সুধার মা বলিল "উঠ্‌ছ কেন, শুয়ে থাক।" সিধু একটা

ছিন্ন কাঁথা তাহার মাতার শয্যার পাশে বিছাইয়া দিল। সুধা ও তাহার মা তাহাতে বসিল।

সুধাকে দেখিয়া সিধুর মা বলিল, "আহা একি তোমার মেয়ে বাছা! তোমার মেয়ের এত রূপ!"

"হাঁ এ আমারই মেয়ে।"

"মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, মুখ খানি টল টল করছে—যেন চাঁপা ফুল। কি নাম বাছা তোমার?"

সুধা আনত-নয়নে তাহার নাম বলিল।

"বেঁচে থাক বাছা। আহা এমনি একটা মেয়েকে আমি বেটার বউ করতে পারি!" বলিয়া সিধুর মা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল। সুধার কর্ণমূল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে তাহার মাতার দিকে চাহিল। সিধু দরজার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল, তাহার গণ্ডদ্বয় তখন যে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা কেহ লক্ষ্য করিল না।

সিধুর মা বলিতে লাগিল, "বাছা আমাদের দুঃখের কথা আর কি বলবো। আমাদের সোনার সংসার ছিল—গোয়াল ভরা গরু, ঘরে রোজ আধ মণ দুধ হত। তিন খান লাঙ্গল ছিল। একজনের সঙ্গে সব গেছে, বাছা। গরু গুলো বেচতে হয়েছে, যা জমি আছে তাতে এ দুবছর ফসল হয় নি। গরু বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেছে। তাই সংসার কোন রকমে চলছে। পোড়াকপালী আমি এই দুঃখ দেখবার জন্যই রয়েছি, জানিনা অদৃষ্টে আর কি আছে।"

তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সুধার কোমল হৃদয়ে তাহার কথা গুলা একটা তীব্র বেদনার দাগ দিয়া গেল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নির্ব্বাক্ ভাবে শুনিতে লাগিল।

"বাছা এ-ই আমার ছেলে, এর গুণের কথা আমি কি বলব। আহা ভেবে ভেবে মুখখানি ওর কালি হয়ে গেল, আর ওর সেবার কথাই বা কোন্ মুখে বলি—বাছা আমার নিজে রাঁধে নিজে খায়, প্রায় সমস্ত দিন আমার শিয়রে বসে রয়, আর এক দৃষ্টে চেয়ে ভাব্‌তে থাকে। কোথায় বাছা বউ নিয়ে ঘর কন্না করবে, তা না আমি তার হাড় মাস ছাই করলাম; একটী দিনও তার মুখে হাঁসি দেখলাম না, আমার মরণও হয় না!" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

গৃহে সকলেই অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিল কাহারও কোন বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, নিস্তব্ধ ঘরে মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে সুধার মা বলিল, "কেঁদে আর কি করবে, যা কপালে আছে তাই হবে, তার জন্য দুঃখ করে আর কি হবে। দেখি তোমার গা—উঃ এখন ত খুব জ্বর।"

সুধাও তাহার কপালে হাত দিয়া জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিল। রোগিণী এতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শ্রান্ত হইয়া তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

সিধু সুধার মাকে বলিল, "মার জ্বর কাল রাত হতে

বেড়েছে, আমি মাকে ফেলে হাটে যাব কি করে, তাই ভাবছি। হাটের বেলা হতে আর বেশী দেরী নাই।"

"তোমার আজ গিয়ে কাজ নেই।"

"না, গোটা কতক শশা ও কিছু শাক আছে—শশা গুলু আজ না বেচলে পচে যাবে।"

"তবে—"

সুধা তার মাকে ধীরে ধীরে অনুনয় করিয়া বলিল, "মা, আমি থাকি এখানে; আমার ধামাটা তোমরা নিয়ে যাও, আমি বেশ বসে থাকতে পারব"।

"তুই পারবি, আচ্ছা বেশ; চল তা হলে আমরা যাই।"

করুণ-হৃদয়া সুধার মুখে একটু আনন্দের রেখা দেখা গেল। সুধার মা ও সিধু ঘর হইতে বাহিরে চলিল।

সিধু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে একবার সুধার কোমল মুখের দিকে চাহিয়া গেল। সুধা তা দেখে নাই, সে তখন নত বদনে রোগিণীর কপালে হাত বুলাইতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে রোগিণী একবার জ্বরের যন্ত্রণায় চমকাইয়া উঠিয়া দেখিল, কে তাহার কপালে এক খণ্ড নেকড়া ভিজাইয়া দিতেছে।

"কে গো তুমি?"

"আমি, মা চিনতে পারছ না?"

"ও—তু—উ--ই মা; আয় বাছা" বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, সুধা তাহা বুঝিয়া

তাহার তপ্ত বুকের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিল। কতক্ষণ যে সুধা ঐ ভাবে থাকিল তাহা কেহ জানে নাই। আর সিধুর মার চক্ষু হইতে বিগলিত অশ্রুধারা, শেষে যে গণ্ডদ্বয়ে শুকিয়া গেল, তাহাও কেহ দেখিল না।

প্রতিদান

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সুধার ভয় করিতে লাগিল, সে রোগিণীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, রোগিণী তখন ঘোর তন্দ্রাভিভূত, তাহার কোন সংজ্ঞা ছিল না।

সন্ধ্যা হইতেই সিধু ও সুধার মা হাট হইতে ফিরিয়া আসিল।

"মা আমার বড় ভয় হচ্ছে; কি রকম করে রয়েছে দেখ—একবারে নিঝুম, সাড়া নেই।"

সুধার মা মাথার শিয়রে বসিয়া রোগিণীর কপালে হাত দিল। রোগিণী চক্ষু মেলিয়া দেখিল সুধা সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে, বলিল, "সিধু কোথায় গেল? একবার তাকে ডাক, আমার বুকের ভিতর কি রকম করছে।" বলিয়া আবার চক্ষু বুজিল।

সিধু বুঝিল না, কিন্তু সুধার মা বুঝিল রোগিণীর অবস্থা খুব খারাপ, সে খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু কাহাকেও কোন

কথা বলিল না। শেষে সুধাকে ঘরের দাওয়ায় আসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হারে, আমাদের ছোট দাদাবাবুকে একবার ডাকলে হয় না? তার কাছে ওষুধ আছে—সিধুর মা বোধ হয় বাঁচবে না, ছোট দাদা বাবু কি বাড়ী আছে, অনেক দিন তিনি আমাদের ওখানে আসেননি।"

"হাঁ বাড়ী আছেন, সে দিন রাস্তায় তাঁকে দেখেছিলাম। তাঁকে বললে তিনি আসবেনই—কে ডেকে নিয়ে আসবে?"

"আমরা দুজনে যাই চ।"

সিধুকে বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। সিধু একা মাতার নিকট বসিয়া রহিল।

দেবিদাস সন্ধ্যার সময়ে বাড়ীতে ছিল না—হৈমী বলিয়া দিল, দাদা হরিমোহন বাবুর বাড়ী গেছে। সুধা ও তাহার মা তাহাকে সেখানে খুঁজিতে গেল।

হরিমোহন বাবুর বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহারা বারাণ্ডার এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। হরিমোহন বাবুর বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছিল—একটী ভদ্রলোক, সুধা অথবা তাহার মা তাহাকে কখনও দেখে নাই,—কি পড়িতেছিলেন, হরিমোহন বাবু ও দেবিদাস তাহাই শুনিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সুধার মা একটু ব্যস্ত স্বরে ডাকিল "ছোট দাদা বাবু, একবার এ দিকে আসুন ত।"

দেবিদাস কহিল, "কেন কি হয়েছে?" সে উঠিয়া আসিল।

সুধার মা কহিল—"পূব পাড়ায় এক জনের খুব অসুখ, যায়—যায়—আপনি চলুন একবার তাকে ওষুধ দিতে হবে।"

দেবিদাস দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার হোমিওপ্যাথিক বাক্স আনিতে বাড়ীর দিকে চলিল।

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছ, কি হয়েছে ?" "এক জনের খুব অসুখ, আমাকে এখনি যেতে হ'বে। কাল আবার সে আলোচনাটা হবে।"

শীঘ্রই সে তাহাদের বাড়ী পৌছিল; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্সটা লইয়া হৈমীকে বলিল, "হৈমী, আমার আসতে অনেক রাত হতে পারে; তুই খাবার ঢেকে রেখে শুয়ে পড়িস। বসে থাকিস না। এক জনের ভারী অসুখ।" সুধা ও তাহার মা পিছনে চলিল।

দেবিদাস তাড়াতাড়ি চলিল, রাস্তায় সে কোন কথাই কহে নাই, শুধু একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমরা সেখানে কতক্ষণ ছিলে ?"

"এই সেখান হতে আসছি।"

"সুধাও ছিলি নাকি ?"

সুধার মা কহিল—"হাঁ, ঐ ত আজ সমস্ত দিন সেখানে ছিল।"

তাহারা তিনজন সিধুর কুটীরে পৌছিয়া দেখিল, সিধু কাঁদিতেছে। দেবিদাসকে দেখিয়া সিধু চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দাঁড়াইল।

সুধার মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে? সিধু শোকে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"মাকে ডাকছি, সাড়া দিচ্ছেনা।"

দেবিদাস গায়ে হাত দিয়া দেখিল হাত পা হিম হইয়া আসিয়াছে।

সুধার মা তাহাকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করাতে সে চক্ষু খুলিল; ক্ষীণস্বরে সে তাহাকে কহিল, "আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচবনা; কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়েও মরতে পারছি না। এ সময়েও সিধুর দুঃখ ভেবে বড় কষ্ট হচ্ছে। ভাই, সিধুকে দেখবার আর কেউ নাই, ওকে তোমায় সঁপে দিলাম; আর যদি সুধাকে ওর হাতে দাও—সুধা ওকে যত্ন করতে পারবে সেও সুখে থাকবে। সুধা, আয় মা বাছা, তুই আমাকে আজ বড় যত্ন করেছিস, আমার শেষ দিনে বড় সুখ দিলি—" বলিয়া সুধার হাতখান সে তাহার ক্ষীণ মুষ্টিতে ধরিল। আবার সুধার মাকে কহিল, "একবার সিধুকে ডাক আমার কাছে বসুক। সে কই? তার হাতটা দেখি।"

সুধার মা সিধুর ডান হাতটা তুলিয়া দিলেন। সিধুর মা সুধার হাত তাহার উপর রাখিয়া কহিল, "তোরা দুজনে এক সঙ্গে সংসার করিস, আমার কথাটা রাখিস, দেখিস তোদের সুখ হবে।"

কহিয়া সে চুপ করিল। তখন তাহার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখে একটা আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ওষ্ঠদ্বয়ে একটা হাসির রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল।

সুধা ও সিধুর দুই জনের বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

দেবিদাস একটা শিশিতে ঔষধ ঢালিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া এতক্ষণ সব শুনিতেছিল। এক্ষণে ঔষধ দিবার সুযোগ পাইয়া মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া ঔষধ ঢালিয়া দিল। ঔষধটা গলার ভিতর প্রবেশ করিল না, গণ্ডদ্বয় বহিয়া পড়িয়া গেল। ক্ষণ-কালের জন্য সিধুর মা চক্ষু খুলিল, তাহার পর চক্ষু যে বুজিল তাহা চিরকালের জন্য।

বাঙ্গালার চিররুগ্না ঔষধ-পথ্যানভ্যস্তা সিধুর মা অর্দ্ধাশন অনাহার ও রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইল। ইহ সংসারে সে কখনও ঔষধ পায় নাই অথবা খায় নাই—এখন যেখানে গেল সেখানে রোগ নাই, কেহ ঔষধ দিতে আসিবে না।

সিধু দুই হাতে মার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া শিশুর ন্যায় "মা গো! মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুধা ও তাহার মা অশ্রুধারায় অঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিল। শুধু দেবিদাস কাঁদিল না; দুই হাতে বুক চাপিয়া সে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবিদাস পাড়ার প্রতিবেশীদের মধ্যে দুই জনকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা, সিধু ও দেবিদাস মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে গেল।

সুধা ও তাহার মা অবসন্ন ও ভগ্নহৃদয় লইয়া তাহাদের কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

যথা সময়ে শ্মশানে ধবক্ ধবক্ করিয়া চিতা জলিয়া উঠিল। সিধুর সংসারের শেষ অবলম্বন তাহার সঙ্গে পুড়িয়া গেল। চন্দ্রের ম্লান রশ্মি জলন্ত চিতাকে স্পর্শ করিয়া গেল। চিতা হইতে উত্থিত নীল ধূম রেখা ঝাউ গাছের অন্ধকারে মিলিয়া যাইল। অদূরে শৃগাল মনুষ্য সমাগম দেখিয়া ডাকিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া চোখ গেল, চোখ গেল, করিয়া একটা পাখী অধীরভাবে ডাকিয়া দিগ্‌দিগন্তে একটা উদাস সুর ঢালিয়া দিল। তাহার পর সব শেষ হইল।

শ্মশানের পশ্চাতে একটা বৃহৎ ঝাউ গাছ হইতে একটা পেচক বিকটস্বরে চন্দ্রকিরণকে তাহার অবজ্ঞা জানাইল। নৈশবায়ুপ্রবাহে হেলিয়া দুলিয়া ঝাউ গাছগুলি বিকট প্রেত-মূর্ত্তির অনুকরণ করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল।

আকাল

ইতিমধ্যে হরিদাসের বিবাহ হইয়া গেল। হরিমোহন বাবুর এক মাসতুত ভগ্নীর সহিত হরিদাসের বিবাহ হইল। ঘর খুঁব ভাল। কলিকাতায় বাড়ী। কন্যার বড় ভাই কলিকাতার কোন বিখ্যাত সংবাদ পত্রের সহযোগী সম্পাদক। বৌ ঘরে আসিলে হৈমী ও তাহার দিদি বৌ দেখিয়া খুব আনন্দিত হইল।

হরিদাস কিছুদিন পরে পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং বৌকেও বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

হরিমোহন বাবু এই বিবাহের পর হৈমী ও তাঁহার নিজ কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

দেবিদাস বলিল, "কাকাবাবু, হৈমীও এখন ছোট, আর দুদিন যাক্ না। দাদার বিয়েতে অনেক টাকা ব্যয় হ'ল, দুদিন না গেলে হৈমীর বিয়ের টাকা যোগাড় হবে কি করে?" হরিমোহন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "টাকা দিয়ে মেয়ে গছিয়ে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছে নাই দেবী। এমন ঘরে মেয়ে দেব যারা হৈমীর যা পুরামূল্য তাই দিয়ে তাকে নিয়ে যাবে। যারা হৈমীকে নিতে আসবে তাদের আগ্রহ না দেখলে বিয়ে দেওয়াও যা মেয়েকে জলে ফেলে দেওয়াও তা; আমি এমন বিয়ে তোমাদের দিতে দেব কেন?"

দেবী। কিন্তু সমাজে যে নিন্দে হবে?

হরিমোহন। কুলীনের ঘরে যে আগে কত মেয়ে চিরদিন অবিবাহিতাই থেকে যেতো; তখনতো জাত যেত না। আমি বলছি তুমি ভয় পেয়োনা, হৈমীর ভাগ্যে যদি সুপাত্র থাকে তাহ'লে শীগ্‌গির সে দেখা দেবে।

দেবী। আর—

হরিমোহন। আর কি?

দেবিদাসের কেমন লজ্জা লজ্জা করিতেছিল, তথাপি হরিমোহন বাবুর দিকে না তাকাইয়া বলিল, "মন্টুর কথা

জিজ্ঞাসা করছিলাম।" হরিমোহন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তার জন্য ভাবনা নেই, তার জন্য আমি এক সুপাত্র ঠিক করে রেখেছি যাকে পেলে রাজার মেয়ে সৌভাগ্য বলে গণ্য করবে।"

দেবী। কে সে? কোথায়?

হরিমোহন। যেখানেই হ'ক সময় মত দেখতে পাবে।

দেবিদাস কয়েকদিন কেলোর কোন খবর লইতে পারে নাই। প্রথমে দাদার বিবাহের গোলমাল। তাহার পর তাহার দাদার শ্যালক, যিনি সম্পাদক, তিনি হরিমোহন বাবুর নিকট আসিয়াছেন। তাঁহার নাম সুধাংশু বাবু। সুধাংশু বাবু ও দেবিদাস দুই জনে মিলিয়া খুব তর্ক আলোচনা করিতেছিল, তাই দেবীদাসের মনে কেলোর বাড়ীর কথা একবারও উদয় হয় নাই। সেদিন যে শ্মশানে যাইয়া সিধুর মার মৃতদেহের সংকার করিল ও সিধুকে যে তাহার বাড়ী লইয়া আসিল, তাহার পর হইতে দেবিদাসের মনের উপর একটা গুরুভার চাপিয়া রহিয়াছে। এখন সে অনুতপ্ত হইয়া এ কয়দিনের গোলমালকে একেবারে মন হইতে বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

সিধুকে এখন সে তাহার বাড়ীতে আনিয়াছে, তাহার নিকট হইতে তাহার ঘরের খবর সমস্ত লইয়াছে; এই যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি আপনার একটি মাত্র সন্তানকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতেছে অনুভব করিয়া মৃত্যুশয্যায় একটা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া গেল, তাহার প্রথমে বোধ

হইয়াছিল জ্বররোগে ও ঔষধাভাবে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে ; কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে তাঁহার মৃত্যুর কারণ জ্বর নহে, কোন ব্যাধি নহে, বহুদিবসের অর্দ্ধাশন ও অনশন সে মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে পুত্রের অনাহারের নিশ্চয়তা মাতার হৃদয়কে শেলের মত বিদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর দেবিদাস যখন হৈমীর নিকট হইতে খবর পাইল—কেলোর স্ত্রী তাহাদের পরিবারের জন্ত দুইদিন অন্তর আসিয়া চাউল লইয়া যায়—তখন তাহার আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না—যে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া তাহাদের গ্রামের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এখন অসংখ্য দরিদ্রের মৃত্যু অনিবার্য্য, যদি শীঘ্রই একটা কোন উপায় নির্দ্ধারণ করা না হয়। ইহা ভাবিয়া তাহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। সে নিজের মনে কোন একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। শেষে স্থির করিল, কেলোর নিকট যাইয়া একবার অবস্থাটা জানিয়া লই, সে কি ভাবিতেছে তাহা একবার জানিয়া আসা যাউক।

কেলোর কুটীরে গিয়া দেবিদাস দেখিল, পাঁচ ছয় জন লোক দাওয়ায় বসিয়া রহিয়াছে, তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়াই তাহারা কথোপকথন বন্ধ করিল।

দেবিদাস কহিল—কি হে তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে ?

কেলো কহিল—এঁকে আমাদের কথা বল্লে কোন দোষ হবেনা, জানিসনি ইনি আমাদেরকে কত ভাল বাসেন ?

যাহারা সেখানে ছিল তাহারা সকলেই গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান। কেলো তাহাদের মধ্যে বয়সে ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, তাই তাহার নিকট উহারা একটা পরামর্শ লইতে আসিয়াছিল।

তাহাদের মধ্যে একজন কেলোর কথা শুনিয়া কহিল, বাবু, আমাদের একটা বিচার করতে হবে।

দেবিদাস জিজ্ঞাসা করিল—কেন, কি হয়েছে তোদের?

বাবু আমরা সব গাড়ী বহি, আমাদের তাতেই কোন রকমে চলে। এখন আমাদেরকে গাড়ী বহা একেবারে বন্ধ করতে বলছে, তা না ক'রলে আমাদেরকে ধরে মারবে।

দেবিদাস কহিল—কে মারবে, কেন বন্ধ করতে বলেছে?

সে কহিল—নায়েব ম'শায়ের আড়তে দু'হাজার মন চা'ল মজুত এখন, আমরা তাঁরই চাকর, চিরকাল তাঁর আড়ত হতে চাল ইষ্টিশনে পৌছিয়ে দিই। কয়জন মাতব্বর লোক বলছে, আমরা চাল বইতে পাবোনা। আমরা কি করে খাব তা তারা দেখ্‌বে না।

"তারা কি বলছে, কেন চাল বহিতে দেবেনা?"

"বল্‌ছে যে চাল আরও আক্রা হবে; এখন পাঁচ সের হয়েছে, এর পর আড়ত হতে চাল গেলে আরও দাম চড়বে।"

দেবিদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কয়জন আছ? প্রত্যেক খেপে কত পাও?"

"আমরা পাঁচজন আছি, আমাদের রোজ আট আনা করে।"

দেবিদাস কেলোকে কহিল, "আমি এদের প্রত্যেককে আট আনা করে রোজ দেব, এরা নায়েবের কাজ করতে পাবে না, আমি যেখানে গাড়ী যেতে ব'লবো সেখানে যাবে—তুমি এদের রাজী করাও।"

সকলেই বলিয়া উঠিল—"তা বেশ ত, এর কথা কি—আমাদের দুকূল রক্ষা হ'ল। আমাদেরকে কেহ কিছু বল্‌তে পারবে না, আর পেটও ভর্‌বে। বাবু, তাই কথা রহিল।"

"আচ্ছা কাউকে বলিস্‌নি যেন!"

কিছুক্ষণ পরে গাড়োয়ানেরা আনন্দচিত্তে গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেল।

দেবিদাস কেলোর কুটীরের দাওয়ায় একটা টুলের উপর বসিয়া কহিল—"সেত গেল—সুধার বিয়ে দিচ্ছিস কবে—আমাদের বাড়ীতে যে বর হাজির রয়েছে।

"হাঁ, আমি সব সুধার মার কাছে শুনেছি। আপনার কি মত—হঠাৎ দেখা শুনা নাই, তার মা মরবার সময় ব'লে গেল বলে বিয়ে দিব, লোকে কেউ কিছু বলবে না ত?"

"তাতে আর দোষ কি—ভালই সম্বন্ধ হয়েছে—সিধু বেশ ভাল হবে, আমি তার এ ক'দিনের কাজ কর্ম দেখে বড় খুশী হয়েছি।"

"বেশ বাবু, আপনি বললে ত কথাই নাই—তা এখন ত বিয়ে দিতে পারবো না—যে কাল হয়েছে—এখন আর খরচ কোথায় পাব—ভাগ্যি আপনি আছেন তাই দুমুটো খেতে পাচ্ছি—আমার বার পয়সা মজুরী ও গোটাকতক শসা কল্মী বেচে কি তিনটা পেট চলে ?"

"তা বিয়ে না হয় পরে দিস ; কিন্তু যে অকাল প'ড়ল, লোকে যে খেতে না পেয়ে মরতে চললো !"

"তাইত বাবু ভগবানের মার ; ভেবে কি করবেন !"

সুধা এতক্ষণ ঘরের ভিতর ছিল। ঘর হইতেই তাহার বিবাহ সম্বন্ধে কথা শুনিতে পাইয়াছিল। দেবিদাস যখন "সুধা কোথায় রে—ও সুধা" বলিয়া ডাকিল, সে উত্তর না দিয়া কুটীরাভ্যন্তরেই রহিল। তাহার মা যখন বলিয়া দিল যে সে সেখানে রহিয়াছে এবং তাহাকে যাইতে বলিল, তখন সে বাহির হইয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

উদ্বিগ্ন

সেদিন রাত্রে বাটী যাইয়া দেবিদাসের ভাল আহার হইল না। আহারের সময়েও সে তাহার চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে নাই। কি করিয়া তাহার কাজটা সফল হইবে, কোন্ কোন্ বিঘ্ন ঘটিতে পারে এবং সেই বিঘ্ন নিবারণের উপায় সে করিতে

পারিবে কি না—ইহা সে অবিরাম চিন্তা করিতেছিল। তাহার মনটা সম্পূর্ণ ঐ দিকেই ছিল, আহারের সময়ে সে শুধু কয়েকটি মাংসপেশীর সঞ্চালন করিয়াছিল মাত্র। আহার শেষ করিয়া যখন সে মুখ ধুইতে গেল তখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল—আহার নামক একটি এত বড় ব্যাপারকে সে এত লঘু করিয়া ফেলিয়াছে এই মনে করিয়া সে মনে মনে একটু হাসিল।

শয্যাতেও সে অত্যন্ত অস্থির বোধ করিতে লাগিল। সমস্ত বাধা বিঘ্নগুলি যেন প্রকাণ্ড ভয়ানক হইয়া তাহার কাজটাকে একেবারে নিষ্ফল করিয়া দিবার জন্য জোট বাধিয়াছে, তাহার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাহাকে অত্যন্ত লজ্জা দিতেছে, আবার রোষকষায়িত নয়নে তাহাকে এক অতল গহ্বরে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে, সে গহ্বরে পড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার সে চেষ্টাও বিফল হইতেছে। এই ব্যর্থতায়, এই নৈরাশ্য, এই অসহায় অবস্থায়, দেবিদাস আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল ; তাহার পর ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিল এই বিঘ্ন গুলা এত সামান্য যে, তাহা হইতে ভয় পাইবার তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ভিন্ন অপর কোন কারণ নাই। সে কিছুতেই ঐ বিঘ্নগুলির অসামান্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, অথচ কিছু পূর্ব্বেই সে বোধ করিতেছিল যেন সে এক অতল গহ্বরে পড়িয়া গভীর জলে হাবু ডুবু খাইতেছে! সে মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ঐ বিঘ্ন

গুলা তাহাকে জলের উপরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিতে দিতেছে না। ইহা তাহার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে বালিকাটী দুইবার এ পিঠ ও পিঠ করিয়া হৈমীকে ডাকিল।

হৈমী ঘুমাইতেছিল; কিন্তু তাহার ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—"ঘুমুই নি। কেন দাদা?"

দেবিদাস কহিল—একবার এদিকে আয়। হৈমী শয্যার পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন তোমার অসুখ করেছে নাকি?

"না, তুই একবার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দে ত।"

"উঃ তোমার কপালটা এত গরম—আমি জলপটি দিয়ে দিই।"

"না জলপটি দিতে হবে না, আমার জ্বর হয়েছে নাকি যে জলপটি দিবি? একটু হাত বুলো।" হৈমী তাহার দাদার মাথা ও কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। দেবিদাস তাহার মনের অস্বাভাবিক চিন্তাগুলিকে দূর করিবার জন্য হৈমীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হৈমী দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"দাদা, সিধুর সঙ্গে সুধার বিয়ে হবে, তুমি জান?"

"কে বললে তোকে?"

"না, বলব না, যদি রাগ কর?"

"হাঁ বল্; কে রাগ করবে?"

এরূপ হাঁ, না, কিছুক্ষণ চলিল—শেষে হৈমী কহিল—"সিধু

আমাকে বলেছে, তাই ঠিক হয়েছে—যে দিন সুধা দিদি চাল নিতে এসেছিল সিধু তাকে বলেছে। তুমি যেন ওকে কিছু বলো না, তা হলে আমার উপর খুব রাগ করবে।"

দেবিদাস কিছুক্ষণ পরে কহিল—সত্যি নাকি?

"সত্যি নয় কি মিথ্যে বলছি—আমি বুঝি মিথ্যা কথা বলি?"

"হাঁ, মাঝে মাঝে বলিস্।"

"না, বলি না।"

"হাঁ সে দিন বলেছিলি—সেই সে দিন।"

ইত্যাদি হাঁ, না, আবার কিছুক্ষণ চলিতেছিল, এমন সময়ে দরজার শিকল নাড়িয়া একজন ডাকিল, "ছোট দাদা বাবু, দুয়োর খুলুন ও ছোট দাদা বাবু!"

দেবিদাস ও হৈমী দুই জনেই সুধার কণ্ঠস্বর চিনিল। দেবিদাসের বুকটা হঠাৎ কি জানি কেন কাঁপিয়া উঠিল।

হৈমী তাড়াতাড়ি যাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া সুধা হাসিয়া কহিল—হৈমী দিদি এখনও ঘুমোওনি—

"না, দাদার সঙ্গে গল্প করছিলাম।"

দেবিদাস সুধাকে শয্যা হইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে, এত রাত্রে যে?"

"বাবা পাঠিয়ে দিলে আপনি খুব ভোরে একবার যাবেন—আমাদের ঘরে কজন লোক আপনাকে কি বলবে।"

"কি কথা তুই কিছু জানিস নি?"

"না আমাকে ত কিছু বলে নি।"

"আচ্ছা ভোরেই যাব।"

"আমরা ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ঘুমিয়েছেন, তাই সকালে আসতাম কিন্তু বাবা এখনি আসতে বললে।" এই বলিয়া সুধা বাহির হইয়া গেল। হৈমী তাহার পিছনে দরজায় খিল দিতে যাইল। সুধা যাইবার সময়ে পার্শ্বের ঘরে যে ঘরে সিধু থাকে তাহার দরজা বন্ধ দেখিয়া গেল—তাহার হৃদয় হইতে অমনি একটা যে দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া নৈশ অন্ধকারে নীরবে মিশিয়া গেল তাহা শুধু হৈমী কেন অন্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারিল না। সুধা হাসিয়া বলিল—"যা হৈমী দিদি ঘুমো গে" কহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া তাহাকে সস্নেহে বুকের ভিতর টানিয়া মস্তক চুম্বন করিল। তাহার পর বাহির হইয়া গেল।

দেবিদাস হৈমীকে শুইতে বলিল। সে নিজে আরও কিছুক্ষণ শয্যায় ছটফট করিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

দেবিদাস প্রভাতে কেলোর বাড়ী গিয়া যাহা শুনিল তাহাতে রাগে ও ঘৃণায় সে কাঁপিতে লাগিল।

কেলোর দাওয়ায় পাঁচ ছয় জন লোক বসিয়া ছিল, সকলেরই মুখ শুষ্ক, কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না, তাহাদের মধ্যে এক জন এই শোক দুঃখের কাহিনী বলিয়া যাইতেছিল, আর তাহা শুনিয়া দেবিদাসের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল!

তাহারা কাল কেহই গাড়ী বইতে যায় নাই। তাই

সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে নায়েব মশায় ডেকে পাঠান। সকলেই সন্ধ্যার পর কাছারী বাড়ীতে উপস্থিত হইল। যাইবামাত্র তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—

"বেটারা তোদের গতিক খানা কি? গাড়ী বইতে হবে কি মনে নেই—গাড়ী এনেছিস্?" তাঁহার তখনকার মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

তখন তিনি বলিলেন—"কি গো কথাটা কানে পৌচেছে, একবার ভাল করে কথাটা পৌছিয়ে দেব কি?"

তখন ইহাদের মধ্যে একজন কম্পিতস্বরে বলিল, "আজ্ঞে হুজুর আপনি গরীবদের মা বাপ,—আপনার সকল কাজ করতে পারব, কিন্তু আমরা আর চাল বহিতে পারব না—কখন না, কখন না।"

এই শুনিয়া নায়েব মহাশয় তাহাদের খুব গালাগালি দিয়া পাইকদিগকে তাঁর নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন। রামচরণ আগে ছিল, সে আগে গেল।

সকলেই পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিল—শীঘ্রই তাহারা একটা নিদারুণ দৃশ্য দেখিবে। নায়েব মহাশয় ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার কথা কানে পৌচেছে? এখনও বল, বহিবি কিনা?"

রামচরণ ধীরে ধীরে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমরা বহিব না।"

তাহা শুনিয়া নায়েব মহাশয় ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মুখে

এক ঘুষি মারিলেন—তাহার নাক দিয়া রক্তের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল।

সে রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিতেছিল, "আমাকে মেরে ফেলুন, আমরা কেউ গাড়ী বহিব না।" "মুখ সামলে কথা ক"—বলিয়া নায়েব মহাশয় তাহাকে একটা পদাঘাত করিলেন।

তাহা দেখিয়া রামচরণের দাদা থাকিতে পারিল না। নিকটে একটা ইট ছিল। সে ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া নায়েব মহাশয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ইট ছুড়িল। ইটটা মস্তকে না লাগিয়া নায়েব মহাশয়ের দক্ষিণ স্কন্ধে সজোরে আঘাত করিল। জলন্ত আগুনে ঘি পড়িল। নায়েব মহাশয় পাইকদিগকে হুকুম দিলেন, উহাকে গারদ ঘরে লইয়া যাও। আর অন্য সকলকে পঞ্চাশ জুতা লাগাও।

পাইকরা নাগরা জুতা না পাইয়া তাহাদিগকে লাঠি দিয়া প্রহার করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ এরূপ প্রহারের পর নায়েব মহাশয় নিকটে আসিয়া কহিলেন—"আর বলবি যে গাড়ী বহিতে পারবিনি—এখন গাড়ী বহিতে পারবি কি না বল—" বলিয়া, এক এক জনের চুল ধরিয়া খুব জোরে টান দিলেন।

ইহারা তবুও বলিল—"না কখনও বহিব না।" নায়েব মহাশয় কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া নিস্তব্ধ রহিলেন; কিন্তু অনতি-বিলম্বেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তবে রে হারাম-

জাদারা"—তখন তাঁর রোষ-বিস্ফারিত-চক্ষু শৃগালের চক্ষুর মত রাত্রির অন্ধকারে জলিয়া উঠিয়া ছিল। তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্রোধে কাঁপিতেছিল।

"দেখবি—ওরে কালু, ওরে বংশী—নে এই গুলোকে আচ্ছা করে জব্দ কর্। এমন মারবি যে একমাস যেন উঠতে না পারে।" দুইটী ঠিক যমদূতের মত পাইক উহাদিগকে ধরিয়া অবিরাম প্রহার করিতে লাগিল—যন্ত্রণায় ছট ফট করিতে করিতে উহারা এক একবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। তখন কাছারীর ঘরের ভিতর হইতে তাহাদের রোদন ধ্বনির বিকৃত প্রতিধ্বনি করিয়া নায়েব মহাশয় বলিতেছেন—লাগা আরও লাগা—কুচ পরোয়া নেই।

পাইক দুটোর নাম কালু ও বংশী। নায়েব মহাশয় ইহাদিগকে এই সমস্ত নৃশংস কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করেন। দীর্ঘকাল এই নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া তাহাদের প্রকৃতিটাই নৃশংস হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী পাইক অপেক্ষা এই দেশওয়ালী পাইকরা নিষ্ঠুরাচরণে অধিকতর পটু। জগতের নিয়মই এই যে জাতি যত দুর্ব্বল হয়, তার অন্তরাত্মাও তত বিকৃত হইয়া পড়ে, তত সে জাতি অত্যাচারী ও হিংসা নিষ্ঠুরতার আকর হয়।

কালু ও বংশী নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে অনেকক্ষণ মারিল, শেষে যখন তাহারা মাটিতে শুইয়া পড়িল তখন তাহাদিগকে এক একজন লাথি মারিয়া বলিয়া গেল—"যা বেটারা

কালে গাড়ী আনিস।" তাহারা অনেকক্ষণ সেখানে পড়িয়া থাকিল। কেলো ও অন্যান্য কয়েকজন তাহাদের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া বিপদ আশঙ্কা করিয়া কাছারী বাড়ীতে গিয়াছিল, তাহারা উহাদিগকে ধরিয়া আপনাপন বাটীতে পৌঁছাইয়া দিল।

যমদূত

রামচরণের দাদার নাম গুরুচরণ, পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা তাহাকে ক্ষেপাচরণ বলে। তাহার ক্ষ্যাপামি হইতেছে এই, সে সর্ব্বদাই প্রসন্নমুখে প্রায়ই হাসিতেছে ও গুন গুন স্বরে একটা না একটা বৈষ্ণব পদ গান করিতেছে। তাহার গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা—সে গোঁসাইয়ের শিষ্য। তাহার মাথার চুল আধ পাকা আধ কাঁচা। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছে। এত বয়স হইলেও সে নায়েব মহাশয় কর্ত্তৃক তাহার ভাইকে অবমানিত হইতে দেখিয়া সজোরে তাঁহাকে ইট মারিল, তাহার এমন রাগ পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ইহার ফলও তাহাকে ভুগিতে হইল।

প্রহরীরা যখন গুরুচরণকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখিয়া আসিল, তখন হইতে সে হরির নাম লইতে লাগিল। সে নিশ্চিতই বুঝিয়াছিল তাহাকে নায়েব মহাশয় কখনই দয়ার লেশ মাত্র দেখাইবে না। যমদূত দয়া করিতে পারে, তবু

এক্ষেত্রে নায়েব মহাশয় তাহাকে দয়া করিবেন না; এবং সে মৃত্যুরও আশঙ্কা করিতেছিল, কারণ এই ঘরে যে দুই একজনের মৃত্যুও হইয়াছে তাহা গ্রামের কাহারও অবিদিত নাই।

গুরুচরণ অনেকক্ষণ হরিনাম জপ করিল। সে প্রত্যহই সকাল সন্ধ্যায় হরিনাম জপ করে। কিন্তু এ সময়ে এই অসহায় অবস্থায় এবং এরূপ ভাবী বিপদের সম্মুখে তাহার হরিনাম জপটা বেশ ভালই হইল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা পুলকিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ বাহিরে একটা গোলমাল শুনা গেল। অবিলম্বে একটা লণ্ঠন লইয়া চারিজন পাইক আসিল, পিছনে নায়েব মহাশয়ও ছিলেন, তিনিও ঢুকিলেন। আলোতে গুরুচরণ দেখিল—ঘরটা অত্যন্ত অপরিষ্কার—এক কোণে অপরিচ্ছন্ন কাপড় পড়িয়া রহিয়াছে। একখানা ভাঙ্গা চৌকি ঘরের অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া রহিয়াছে।

গুরুচরণ যেমন ছিল সেরূপ মস্তক উন্নত করিয়া বসিয়া রহিল। শুধু একবার বিশ্বাসভরে হরিনাম স্মরণ করিল। পাইকরা তাহার হস্ত পদ বাঁধিয়া তাহাকে তুলিল। গুরুচরণ নড়িল না, কোন কথা কহিল না। ঐ ভাঙ্গা চৌকির নিম্নে চিৎ করিয়া পাইকরা উহাকে শুয়াইল।

একটা পাইক কহিল—"বেটা মিচকে সয়তান—নড়ছে না।" আর একজন কহিল—"ঠিক বেঁধেছিস ত?" তাহারা পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া

সকলে মিলিয়া সেই চৌকি গুরুচরণের বুকের উপর চাপিতে লাগিল। গুরুচরণ বেদনায় অধীর হইয়া হস্তিপদতলে হরিভক্ত প্রহ্লাদকে স্মরণ করিল, তাহার পর অসীম দৃঢ়তার সহিত হরিনাম করিতে লাগিল। যে মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইল সেই মুখেই নায়েব মহাশয় সবলে পদাঘাত করিলেন; কহিলেন —"হারামজাদা যমের বাড়ী যা!" যমের বাড়ী কেন, বৈকুণ্ঠপুরী এরূপ নির্ভীক ভক্তপ্রাণকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য সতত উন্মুখ। এ পদাঘাত খাইবার পূর্ব্বেই গুরুচরণ চৈতন্য হারাইয়াছিল। তাহা ভালই হইয়াছিল। ভক্তমুখে পদাঘাত পাইলে সে যে হরির গায়ে লাগিবে বলিয়া অধীর হইবে!

কতক্ষণ সে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল তাহার ঠিক নাই। যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন একটা প্রদীপের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে—এক কল্যাণের প্রতিমূর্ত্তি সুন্দরী রমণী তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। গুরুচরণ ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কে মা? একটু জল দাও।" রমণীর হস্তে এক ঘটী শীতল পানীয় জল ছিল। প্রদীপটি রাখিয়া সে গুরুচরণের মুখে ঘটীটি ধরিল। গুরুচরণ এক ঘটী জল পান করিয়া ফেলিল। জল পান করিয়া সে একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। রমণী তাহার হস্তপদদ্বয়ের বন্ধনমোচন করিয়া দিল; সস্নেহে তাহার বক্ষের ক্ষতস্থানে আপনার কোমল হস্ত বুলাইয়া দিল। তাহাকে ধীরে ধীরে ভূমি হইতে উঠাইয়া ঘরের এক পার্শ্বে উপবেশন

করাইল। ঘরের বাহিরে যাইয়া একটা বালিশ ও কাঁথা আনিয়া চৌকির উপর একটা শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইল।

তাহার পর ভূমিতলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত কাতর-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তখন তাহার আলুলায়িত ঘন কেশরাশি ভূমিতল স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার কোমলতাপরিপূর্ণ মুখ অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল, কিন্তু, তাহার অশ্রুসজল চক্ষু স্থির ধীর ছিল না—তাহার যৌবনপ্লাবিতা পূর্ণাবয়বা অঙ্গযষ্টির মত প্রশান্ত ছিল না। তাহার চোখ দুটি কি রকম ভাসা ভাসা ঔদাস্য-ব্যঞ্জক ছিল। গুরুচরণ তাহার ক্ষিপ্তের মত উদাস দৃষ্টি দেখিয়া একটু চিন্তিত হইল।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল—"এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে?"

গুরুচরণ কহিল—"হাঁ মা, বেদনা একটু কমেছে, তুমি কে মা, আমার প্রাণ রক্ষা করলে?"

রমণী কহিল—"আমার পরিচয় দিয়ে কিছু লাভ নাই; তুমি পাষণ্ডদের হাতে পড়ে প্রাণে বাঁচলে ইহা তোমার খুব ভাগ্য বল্‌তে হবে। আমি যে তোমার কাছে এই প্রথম এসেছি তাহা নহে; কত লোক যে এখানে তোমার মত মার খেয়েছে তার ঠিক নাই; ইহারা মানুষ নহে পিশাচ, লোককে মারতে মারিতে শেষকালে মেরে ফেলে—ইহাতে তাহাদের অপরাধ নেই, বিচার নেই! কাউকে মারছে জানলে আমি রাত্রে তার কাছে না এসে থাকতে পারি না।"

রমণী কহিতে লাগিল, গুরুচরণ স্থিরনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া শুনিতে লাগিল।

"শুধু পুরুষ নয়, এরা স্ত্রীলোকদেরকেও এখানে ধরে এনে মারে। স্ত্রীলোকদের গায়ের কাপড় খুলে ঐ যে জঘন্য পাষণ্ডের মত কটা পাইক আছে তাহারা তাহাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে মারে, লজ্জা সরম সব যায়—এর চেয়ে আর অধর্ম্ম কি হতে পারে? আর এ সব স্ত্রীলোক কারা জান? যারা সতী সাধ্বী, যাদেরকে এরা ঘর হতে বাহির করে, স্বামী হতে ছাড়িয়ে নিয়ে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে বলে—হতভাগিনীরা যন্ত্রণা সইতে না পেরে শেষে অধর্ম্মকে আশ্রয় করে। এরূপ কত জন আছে জানিতে চাও, তবে একবার রাত্রে জমিদার বাবুর বাগান বাড়ীতে খোঁজ নিও। তাদেরকে দেখলে তোমার বুক ভেঙ্গে পড়বে! হারে হতভাগিনীরা! আমিও তোদেরই মত। তোদের কথা আর কি বেশী বলব?"

রমণীর বিষাদপূর্ণ হৃদয় হইতে একটা গভীর, দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রদীপ শিখা চঞ্চল হইয়া উঠিল! রমণী অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষের জল মুছিল—গুরুচরণ আপনার যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া বাহুর উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর আর্ত্তস্বরে রমণী আবার কহিতে লাগিল,—

"তুমি আমার কথা শুনতে চাও? আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, আমাকে এখন যেমন দেখছ আগে আমি এমন ছিলাম না। আগে আমি কেমন ছিলাম শুনবে?"

রমণী কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিল না—তাহার পর একটু স্থির হইয়া সে তাহার জীবনের ঘটনা প্রকাশ করিল।

পতিতের পুণ্য

আমার স্বামী সামান্ত বেতন পেতেন—তিনি এই জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন, আমাদের অবস্থা ভাল না হইলেও আমরা দুজনে সুখে ছিলাম। তিনি দেখতে সুন্দর ছিলেন, আর আমাকে তিনি বড়ই ভাল বাসতেন। আমাদের দুরবস্থা হইলেও আমরা এজন্য কখনও দুঃখ ভোগ করি নাই, আমাদের অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। আমরা যখন একটি পুত্রের মুখ দেখলাম, তখন আমাদের সে কি আনন্দ, তাহা আর কি বলব?

তাহার পর একদিন—সেই দিনই আমার কাল হইল—আমরা দুজনে এক মেঘলা দিনে বৈকালে বসে গল্প করছিলাম, আমার স্বামী আমাকে বল্লে 'ঐ দেখ আমি ওর অধীনে কাছারীতে কাজ করি' বলিয়া তিনি দরজায় দাঁড়াইলেন। নায়েব মহাশয় ও দারোগা বাবু—এখন যে দারোগা বাবু আছেন এই দারোগা বাবুই তখন আমাদের ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহাদের জানালা দিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার স্বামী দরজা হইতে ডাকিতেই তাঁরা নিকটে আসিলেন। আসিয়াই তাঁরা

দুই জনে আমার দিকে এমন অভদ্রভাবে চাহিলেন যে আমি তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার স্বামী তখনও তাঁহাদিগের সঙ্গে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, আমি স্বামীকে বল্লাম—এ দুইটা লোকের স্বভাব বড় মন্দ, এদের ডেকে ভাল হয় নাই। আমার স্বামী সে কথাটা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। আমার স্বামীর চরিত্র এত সুন্দর ছিল, যে তিনি ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, ইহাদিগের চরিত্র এত মন্দ হইতে পারে। তিনি আমাকে তিরস্কারই করলেন; আমি আর সে কথা তাঁহার নিকট বললাম না। তাহার এক মাস না যাইতে যাইতে স্বামী তহবিল তছরূপ অপরাধে নায়েব কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলেন—দারোগা মহাশয়ও তাঁহাকে অপরাধী স্থির করিয়া আমাদের কুটীরে আসিলেন। কয়েকজন পুলিশ তাঁহাকে হাত কড়ি দিয়া লইয়া গেল। আমার স্বামী যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন, তোমার কোন ভয় নাই; হিসাব পত্রে কোন গোলমাল কেহই পাবে না, আমি চুরি করি নাই, মিথ্যা মোকদ্দমা ক'দিন টিকিবে—আমার বাক্সে যে কয়টা টাকা আছে, তাহার দ্বারায় কোন রকমে চালিয়ে নিও, আমি এলাম বলে।—হা ভগবান্! যিনি এত ভাল ছিলেন, তিনি কি করিয়া জানিবেন এ জগতে সত্য বিচার নাই।

যখন আমি দারোগাকে 'চোর হারামজাদা, বাবু সেজে পাকা চোর' বলিয়া আমার স্বামীকে গালি দিতে ও

আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিলাম, তখন আমার হৃদয় পাষাণের মত কঠিন হয়েছিল—আমার এত দুঃখ হয়েছিল যে, আমার হৃদয় হইতে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে নাই, কণ্ঠ হইতে একটি স্বর বাহির হয় নাই, চক্ষু হইতে একবিন্দু জলও পড়ে নাই। আমার তখন কোন চৈতন্য ছিল না, আমি বসিয়াছিলাম কি দাঁড়াইয়াছিলাম, আমি দেখিতেছিলাম কি চক্ষু বন্ধ করিয়াছিলাম, আমি শুনিতেছিলাম, না, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কি সজ্ঞানে ছিলাম, এ সম্বন্ধে আমার তখন কোন ধারণাই ছিল না। এরূপ পাষাণের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না—হঠাৎ আমার চোখে উজ্জ্বল আলো লাগিল, আমি দেখিলাম ঘন কৃষ্ণ মেঘের আড়ালে সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন, তিনি আরক্ত নেত্রে কিছুক্ষণ দিগ্ দিগন্তে চাহিয়া রহিলেন। সূর্য্যদেবের শেষ কিরণপাত স্নেহ আশীর্ব্বাদের মত আমার ললাটকে স্পর্শ করিয়া গেল—আমি পশ্চিম দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখিলাম রাত্রির অন্ধকার বর্ষার মেঘের সহিত ঘনাইয়া আসিতেছে। আমার জীবন তখন হইতেই সে দিনকার অপরাহ্নের মত অকালে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। এই ঘোর অন্ধকারে আমি আমার চারি বৎসরের পুত্রকে একমাত্র সম্বল করিয়া বুকে টানিয়া লইলাম। সে রাত্রে আমাদের আহার হইল না, আমি সকাল সকাল শয্যায় আশ্রয় লইলাম। সেই রাত্রেই **ঐ মূর্ত্তিমন্ত পশু দুইটা, ঐ দারোগা ও নায়েব, আমার নিকট**

আসিল—আমাকে লইয়া যাইতে চাহিল। প্রথমে তাহারা আমাকে কত প্রলোভন দেখাইল, বলিল আমাকে একটা আলাদা বাড়ীতে রাখিয়া আমার তত্ত্বাবধান করিবে, আমার স্বামী জেল হইতে আর ফিরিবে না, তাহারাই আমাকে আদর করিবে, বেশভূষা অলঙ্কার সব দিবে, কিছুরই অভাব হইবে না। আমি ক্রোধে তাহাদিগকে খুব গালাগালি ও অভিশাপ দিতে লাগিলাম, বলিলাম আমার এই প্রাণ থাকতে, আমি তোমাদের আশ্রয়ে যাব না, শুকিয়া অনাহারে মরব সে ভাল। তখন তাহারা আমার শয্যা হইতে আমার সেই চার বৎসরের সন্তানকে কাড়িয়া লইল। আহা বাছা আমার ভয়ে একবার খুব চীৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু তাহাদের তাড়না শুনিয়া চুপ করিল। আমাকে মা মা বলিয়া আর্ত্তস্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল। তাহারা বাহিরে এক খানা পাল্কী আনিয়াছিল, আমাকে জোর করিয়া তাহারা পাল্কীতে লইয়া বসাইল, বলিল 'তুমি ত আমাদের হাতে এখন, ভাল চাও আমরা যা বলি তাই শুন।' পাল্কীতে ক্ষণ-কালের জন্য আমার পুত্রকে ফিরাইয়া দিল, আমি আমার হারানিধিকে পাইয়া একবার বুকে করিয়া চুম্বন করিলাম, তাহাকে তাহারা অবিলম্বে লইয়া গেল। বাছা 'মা' 'মা' করিয়া চীৎকার করিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল। তাহার করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম; মনে হইল আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ জলিতেছিল, আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,

আমি পাল্কী হইতে লাফাইবার জন্ত একটা শেষ চেষ্টা করিলাম।

পাল্কীর দরজা বাহির হইতে বন্ধ ছিল। আমি পাল্কীর ভিতর রাগে অভিমানে শোকে ছটফট করিতে লাগিলাম, আর মাঝে মাঝে আমার পুত্রের বুকফাটা ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতেছিলাম। আমাকে তাহারা এক দ্বিতল বাড়ীতে লইয়া পৌঁছাইল, আমাকে দ্বিতলের এক ঘরে থাকিতে দিল, কিন্তু আমি আমার সন্তানকে ফিরিয়া পাইলাম না, আমি সেই ঘরে বন্দী রহিলাম। প্রথম দুইদিন তাহারা কেহ আমার নিকট আসে নাই। আমার নিকট তাহারা তিন চারিবার আহার পাঠাইয়া দিত। কিন্তু তাহা একবারেই স্পর্শ করিতাম না, আমি নিরম্বু উপবাসে রহিলাম! তাহার পর ঐ বাটীর ঝি ঘর ঝাঁট দিতে আসিয়া আমাকে বলিয়া গেল, তাহারা দুইদিন হইল আমার স্বামীকে এই ঘরে, যে ঘরে আমরা এখন বসিয়া আছি, প্রহার করিতে করিতে এক বারে মারিয়া ফেলিয়াছে। মারিয়া ফেলিয়া এই ঘরের ঐ কোণে তাহার মৃতদেহ পুঁতিয়া ফেলিয়াছে। ঝি একজন বৈষ্ণবী তাহাদেরই অনুগত, সে মৃদু হাসিয়া কহিল—'ওতে আর ভাবনা কি? এখানে সুখে থাকবে।' আমি দুঃখে রাগে জ্বলিতে পুড়িতে লাগিলাম। সেই দিন রাত্রে তাহারা আমার ঘরে আমার শিশু পুত্রকে লইয়া আসিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। আমার মনে হইল বাছা বুঝি রক্তবমি করে মারা যায়। পুত্র

যখন অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় ভূমিতে শুইয়া পড়িল তখন পাষণ্ডেরা কহিল—'এখনও বল্. ছেলেকে ত—এখনও বল্'—এই বলিয়া তাহারা পুত্রকে আবার আক্রমণ করিল। পুত্রের জীবন রক্ষা করিবার জন্য আমি আমার জীবন, আমার সব বিসর্জ্জন দিলাম. আমি তাহাদের বশীভূত হইলাম।

তাহার পর হইতে আমার জীবনটা নিজের উপর একটা ঘৃণা ও ধিক্কারের ইতিহাস। রাত্রি দিন যে আমি অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, আমার দেহের প্রতি শিরায় যে একটা ঘৃণার তড়িৎ বহিয়া যাইতেছে, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ জানেন না! যে নরপিশাচেরা আমার প্রিয়তম দেবতাকে নিষ্ঠুর ভাবে বিনা অপরাধে হত্যা করিয়াছে আমি তাঁহার পরিণীতা স্ত্রী হইয়া তাহাদের নিকট দেহটা উৎসর্গ করিলাম। যখনি ইহা মনে হয় তখন আমার শরীর লজ্জায় ঘৃণায় আত্ম-গ্লানিতে শিহরিয়া উঠে, আমার হৃৎপিণ্ডটা নিস্তব্ধ হয়। যদি একেবারে নিস্তব্ধ হইত তবে রক্ষা পাইতাম। তাহা ত হয় না। আমি তিন বার আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু হা ভগবান্, তুমি আমার হৃদয়ে শক্তিতেজ কিছুই দাও নাই! আমার আত্মহত্যা করিতে সাহসে কুলাইল না। তিন বারই আমার ভয় হইল, অন্তর হইতে যেন আমি কার ডাক শুনিলাম। মনে হইল আমার পুত্র আমাকে নিষেধ করিল, আমি আত্মহত্যা করিতে পারিলাম না। যাহাদিগকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি তাহাদেরই চরণে এ দেহ উৎসর্গ

করিলাম। কিন্তু যাহার জন্য আমি এ ঘৃণিত জঘন্য জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম, যাহার জন্য আমি মর্ম্মন্তুদ ঘৃণার তাড়নায় জর্জ্জরিত হইলাম, তাহাকে কোথায় পাইলাম! আমি যখনি উহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতাম তখনই উহারা আমার নিকট হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইত, উহাদের মনস্তুষ্টি করিতে পারিলে তাহাকে ফিরাইয়া পাইতাম। শেষে তাহাকে আর পাইলাম না—আমার ভগ্ন বুকের ধন, আমার ঘৃণ্য জীবনের একমাত্র সম্বল, আমার অতীত পুণ্যের এক মাত্র নিদর্শন, আমার বর্ত্তমান পাপের একমাত্র পুণ্য, আমার নরকের একমাত্র পরিত্রাণ, আমার সেই সর্ব্বদুঃখ সর্ব্বঘৃণা সর্ব্বলজ্জা-পাপ-হরাকে আমি হারাইলাম। তাহারা বলিয়াছে, সে আছে; কিন্তু আমার নিকট সে মৃত, সে নাই—সে নাই। সে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার নরকেরও স্থান গিয়াছে। আমি ভ্রষ্টা, আমি অপবিত্রা, আমি কলঙ্কিনী হইয়াছিলাম—বাছা! সে শুধু তোর জন্য। আমি যখন আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম তখন তুইত আমার অন্তঃকরণে আসিয়া চুপি চুপি বলিয়া গেলি, মা তুমি গেলে, আমার যে আর কেউ রহিবেনা! তুই আজ আমাকে ছেড়ে কোথায় পালালি, ধন আমার! এ দেহে পাপ কলঙ্কে ষোল আনা পূর্ণ; কিন্তু আমার মন আমার আত্মা ত তোর পানে চাহিয়া এখনও অধর্ম্ম করে নাই—তোকে ক্রোড়ে লইয়া এখনও পাপপথে যায় নাই, অপবিত্রতার মধ্যে থেকেও তোকে পেয়ে পবিত্র ছিল—তুই

যে আমার পুণ্য, আমার দেবতা, আমার সতীত্ব, আমার ধর্ম্ম, আমার মুক্তি, আমার সব হয়েছিলি, তোকে হারাইয়া আমার জীবন যে একটা মহাপাপে, মহাকলঙ্কে, নিমগ্ন হইয়াছে! আমার মুক্তি নাই! আর বাছা ফিরে আয়, তোর জন্য আমি কলঙ্ক নিলাম, আর তুই আমাকে ত্যাগ করলি! উঃ—" রমণীর কষ্ট বোধ হইল। সে শোকাভিভূত হইয়া আপনার বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল।

নরকে মুক্তি

গুরুচরণ এতক্ষণ রমণীর কথা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে শুনিয়া যাইতেছিল, নিজের যন্ত্রণার দিকে তাহার দৃক্পাত ছিল না, সে স্থির দৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছিল। কিন্তু রমণী যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছিল তাহা নহে; কখন সে গুরুচরণকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, কখন বা উদাস ভাবে ব্যাকুল ভাবে পাগলিনীর মত আপন মনে বকিয়া যাইতেছিল। রমণী যখন অধীর ভাবে বক্ষ তাড়না করিতে লাগিল এবং গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন গুরুচরণ আর শয্যায় থাকিতে পারিল না। নিজের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া সে উঠিয়া বসিল ও রমণীর বাহুদ্বয় চাপিয়া ধরিল।

"মা অধীর হয়োনা মা; বাছা তোমার কোল্ ছেড়ে কোথায় যাবে? সে আসবেই—"

গুরুচরণ একটু দৃঢ়-কণ্ঠে কথাটা বলিল। রমণী কোন কথা বলিল না, স্থির নেত্রে গুরুচরণের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে সে আপন মনে বলিতে লাগিল "সে আসবে—সে আসবে—"

গুরুচরণকে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—সে আসবে, সে আসবে?

গুরুচরণ কহিল—হাঁ. আসবে।

রমণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"বাছা তুমি ছাড়া আর কেহ বলেনি সে আসবে।" কহিয়া হঠাৎ গুরুচরণের পদদ্বয় আঁকড়াইয়া ধরিল, "বল বাছা আমি তাকে কবে পাব, কি করে পাব।" রমণী সবলে গুরুচরণের পদদ্বয় টানিয়া লইয়া আপনার মস্তকে ধরিল। গুরুচরণ পদদ্বয় সরাইয়া লইতে খুব চেষ্টা করিল, কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতেছিল, পারিল না, শেষে তাহার দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল,—কহিল "মা, এ পাপীকে আর পাপ দিয়ো না, তুমি আমার পা ছুঁলে যে আমার নরকেও স্থান হবে না। তুমি যে শুধু, মা, তোমার বাছাছাড়া আর কিছু জাননা, তোমাকে পাপ কলঙ্ক কি কখনও স্পর্শ করতে পারে? তুমি যে আমার মা দেবকী কৃষ্ণ প্রাণধনকে হারিয়ে অবিরাম কাঁদছ, তোমার বুকে পাষাণ, হাতে পায়ে

লোহার শিকল, তুমি কারাগারে বন্দী! মা একদিন তোমার বুক হতে পাষাণ নেমে যাবে, তোমার বাঁধন লোহার শিকল খুলে পড়বে, তোমার জীবন সর্ব্বস্ব এসে তোমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করবে, তোমার বুক-জোড়া ধন, নয়নের মণি এসে তোমার কোলে চড়বে! মা, সে দিন এই পাপীকে চরণে একটু স্থান দিয়ো। মা, আমি যে তোমারই স্নেহের দুলালকে সারাটী জীবন খুঁজছি, সে কাছে আসে ধরা দেয় না, আমি যে তার জন্যে পাগল হলাম! মা, আমি ক্ষ্যাপা হয়েও তাকে পেলাম না—তোমার কোলে যখন সে ঝাপিয়ে পড়বে, তখন একবারে কি আমায় পায়ে ঠেলবে, মা,"—কহিয়া সে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল, রমণীর দুটি চরণে মস্তক রাখিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া দিল।

রমণী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি কি জানি কেন উর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত হইল, আর তাহার পদতলে গুরুচরণ 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রমণী একবার অনুভব করিল, তাহার পঞ্চম বয়স্ক পুত্র বৃদ্ধ সাজিয়া তাহার চরণতলে রহিয়াছে, কহিল—"ওঠ বাছা, ষষ্ঠীর ধন, পায়ের তলায় কেন?" কহিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিল। গুরুচরণ কহিল 'মা, আমায় একবার তোমার পায়ের ধূলো দাও। এমন পায়ের ধূলো আর কোথায় পাব!'

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। উভয়ের চক্ষু দিয়া দরবিগলিত প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। গুরুচরণ দুই

হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল। রমণী বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিল।

তাহার পর রমণী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"বাছা, তুই আমার স্নেহের দুলালকে খুঁজে দিস্, আমাকে বলে দে যাদুমণিকে আমি কোথায় পাব?"

গুরুচরণ কহিল—"মা, সে বাহিরে থাকে না, সে থাকে ভিতরে, হৃদয়ের ভিতর—সেইখানে খোঁজ করিস মা; দেখবি সে সেখানে তোর সঙ্গে কত লুকোচুরি খেলা করবে, একবার কাছে আসবে একবার পালাবে—একবার হাসবে একবার হামাগুড়ি দিয়ে লাড়ুয়া খেতে খেতে আসবে—একবার মোহন তালে নাচতে নাচতে আসবে—কখনও বা হৃদয় হতে বাহির হয়ে সে বাতাসে মিশে যাবে, বাতাস হয়ে তোর কাণে কাণে কত কথা বলবে, তোর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে চোখে ঘুম জড়িয়ে দিয়ে যাবে, আবার জল হয়ে তোর দেহ শীতল পবিত্র করে দেবে, তোর সব সুখ দুঃখ ধুয়ে দেবে—আবার রাত্রি হলে সে আসবে, আর তার হাসি জ্যোৎস্না হয়ে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে! আবার কখন কখন সে রাগবে, তখন ঘন কৃষ্ণ মেঘের মধ্যে তার রক্ত আঁখি বিদ্যুৎ চমকাবে, আর ঘন ঘন বজ্রাপাতে তার হুঙ্কার শুনা যাবে—আবার রাগবে না, হাসবে না, নড়বে না, চুপ চাপ শান্ত স্থির নিশ্চল হয়ে শূন্য আকাশে মিশে যাবে, তখন তোর হৃদয়টা একেবারে খালি শূন্য করে তাকে খুঁজিস. দেখবি সে সেখানে বসে আছে। যখন তোর বড় কান্না পাবে,

দেখিস্, মা তোর হৃদয়ের ভিতর—সেইখানে সে আছে, তোর জন্যেই সে সেখানে বসে মা মা বলে কাঁদছে—তুই সেখানে গেলেই তাহার মুখে হাসি দেখা দিবে, আর তোর কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

রমণী কহিল, "আমার হৃদয়ের ধন হৃদয়েই আছে নয়? আমার যখন বড় কষ্ট হত, আমি যখন বড় কাঁদতাম, আমার যখন এক একবার মনে হত কে যেন আমার ভিতর হ'তে মা' মা' বলে ডাকছে, আর আমি সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু আমি বাছা অন্ধ, আমি তাকে ত আমার ভিতরে খুঁজি নাই, বাহিরে খুঁজতাম, পেতাম না, এবং আরও কাঁদতাম—আর তা করব না বাছা, আমি তাহাকে আমার ভিতরেই পাব।"

রমণী ভরা বিশ্বাসে শান্ত স্তব্ধ হইল, তাহার ক্ষিপ্তের ভাব গেল। সে ধীর ও শান্ত হইয়া অধোনেত্রে ভূমিতলের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা বাছা, সে আমার অন্তরের মধ্যে রয়েছে, আমি এত কাঁদছি, এই নরকে বসে আমি ঘৃণা লজ্জায় মরে যাচ্ছি, সে একবার হৃদয়ের ভিতর হতে, বাহির হয়ে সামনে দাঁড়ায় না কেন, আমি তা হলে, তাকে কোলে করে চুম্বন করে হৃদয় জুড়াতে পারি। আমি কৃমি পোকা হয়ে নরকে বাস করছি তবুও সে চুপ করে বসে দেখছে—যাকে আমি পেটে ধরেছিলুম, সে এত নিষ্ঠুর হ'ল কেন বাছা?"

গুরুচরণ কহিল—"মা, তুই তাকে ভাল বাসিস কি না, সে

দেখছে, তুই শোক দুঃখের মধ্যেও তাকে ভাল বাসিস কিনা সে জানতে চায়, অত্যাচার উৎপীড়ন সয়েও তুই তারে ভাল বাসিস কি না সে পরখ করছে, ঘৃণা লজ্জা নরকেও তার প্রতি তোর টান আছে কি না তাই সে দেখছে। কৃষ্ণ যখন বুঝলে তার মা বুকে পাষাণের চাপ সহ্য করে অহরহ তারই নাম করছে, স্বপ্নে জাগ্রত অবস্থায় সেই তার ধ্যান হয়েছে, তখন কি আর সে থাকতে পারলে, সে দৌড়ে ছুটে এল; কারাগারের লোহার দরজা সেই শিশুর হাতের জোরে ভেঙ্গে পড়ল, পাষাণ তূলার মত হাল্কি হয়ে বুক হতে নেমে গেল, শিশুর আঙ্গুল ছুঁতে না ছুঁতে লোহার শিকল টুকরা টুকরা হয়ে ছিঁড়ে পড়ল, আর দেবকীর কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেবকী বন্দী হয়ে কারাগারেই তাকে পেলে,—শুধু স্নেহের জোরে। দেখিস খুব করে তোর বাছাকে ডাকিস মা—সে এখানেই এসে তোকে উদ্ধার করবে।"

রমণী কহিল—আচ্ছা বাছা আমি নরকের কৃমি পোকা হয়ে এখানেই থাকব, আমার বাছাকে খুব ডাকব, আমি নরকেই বাস করব, আমি কোথায়ও যাব না, এই নরক আমার স্বর্গ হবে, যদি সে একবার আসে। তাকে না পেলে আমার স্বর্গে কি হবে? এই নরকই আমার ভাল, বাছার আমার সব স্মৃতি এই নরকের মধ্য দিয়েই যে আমার দিকে সব সময়ে চেয়ে রয়েছে।

রমণীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল, পবিত্রতার আধার

অনাঘ্রাত কুসুমের মত মুখখানি হইতে সমস্ত বিষাদের রেখা মুছিয়া গেল, হাসির ছটায় সমস্ত কালিমা ধুইয়া গেল।

রমণী নীরবে হাসিতেছিল; কিন্তু গুরুচরণের চোখ দিয়া অশ্রু বহিতেছিল।

রমণী কহিল—আর বাছা, আমার শোক দুঃখের কথা বলে তোমাকে কষ্ট দেব না; একটু স্থির হও, আমি তোমাকে শুশ্রূষা করতে এসে দুঃখ দিলাম।

গুরুচরণ কহিল—না মা, এ কয়েদ ঘরে এসে আমার যে সুখ হল আমার জীবনে তাহা কখনও পাই নাই।

রমণী গুরুচরণের কথা বুঝিতে পারিল না। তাহার দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া থাকিল। গুরুচরণ আবার কি কহিতে যাইতেছিল, কিন্তু কহিতে পারিল না। সে স্থির হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে ছিল স্বয়ং জগদম্বা ঐ রমণীর মূর্ত্তিতে সংসারের সমস্ত ঘৃণা ও লজ্জাকে সীমন্তের সিন্দূর করে, দুঃখকে কণ্ঠহার করে, পাপ ও কলঙ্ককে বসন করে, অটল ধৈর্য্যের শুভ্র মুকুট মস্তকে ধারণ করে, তাহার সম্মুখে সৌম্য মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। গুরুচরণ বুঝিল, জগন্মাতা আপনার সন্তানের জন্য সব নিন্দা লজ্জা ঘৃণা ও পাপকে আপনি বরণ করিয়া সন্তানকে বুকে করিয়া রাখিয়াছেন। এই রমণীর চরণ ধূলা লাভ করিয়া সে জগতের সব নিন্দা ঘৃণা লজ্জা ও পাপকে পূজা করিতে, ভালবাসিতে শিক্ষা করিল।

কিছুক্ষণ পরে রমণী কহিল—তুমি স্থির হও, আর কথা বলো না; অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছ—ওঃ তাইত আমার অাঁচলে বাতাসা বাঁধা আছে, আমি ত দিতে ভুলে গিয়েছি! এস বাছা—খাও।

গুরুচরণ দুই হাত পাতিয়া লইয়া নমস্কার করিল। রমণী এক ঘটী জল আনিয়া দিল।

গুরুচরণ জল ও বাতাসা খাইয়া বেশ সুস্থ বোধ করিল।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল—তুমি একটু জোর পাচ্ছ, না এখনও দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে? হাঁটতে পারবে?

গুরুচরণ কহিল—হাঁ বেশ ভাল বোধ হচ্ছে, হাঁটতে পারব।

রমণী কহিল—চল, তুমি বাড়ী যাও—আমার কাছে চাবি আছে, আমি তালা বন্ধ করে দেব, তারা বুঝতে পারবে না।

গুরুচরণ মাথা নাড়িয়া কহিল—না মা, আমি এ রকম করে যেতে পারব না, এ যে চুরি করে পালান হবে—এমন কাজ করব না।

রমণী একটু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া বলিল—আচ্ছা—যাবে না!—তবে আমি বলি বাছা—তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না, আমার দুঃখের কথা তুমিও একবার ভাবিও, আর, যাহাতে হারাধনকে পেয়ে আমি এই নরক হতে উদ্ধার পাই তাহাও এক একবার ভাবিও।

রমণীর করুণ দৃষ্টি গুরুচরণের হৃদয়কে ব্যথিত করিল, সে নির্ব্বাক্ রহিল।

রমণী ঘর হইতে বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে দরজার পাশে এক কোণে প্রদীপ রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মাটিতে প্রণাম করিল। ঐ কোণেই তাহার স্বামীর মৃতদেহ প্রোথিত হইয়াছিল। রমণী তাহা গুরুচরণকে পূর্ব্বেই দেখাইয়া দিয়া ছিল। গুরুচরণ রমণীর মুখে এক গভীর ও জীবন্ত বিশ্বাসের ছবি দেখিতে পাইল। সে চাহিয়া থাকিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রমণী প্রদীপটা রাখিয়া গেল।

প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। প্রদীপশিখা স্থির ও নিশ্চল ছিল। রমণীর দুঃখ ঘৃণা ও লজ্জা পরিপূর্ণ ব্যথিত হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ঐ প্রদীপ শিখায় পরিণত হইয়াছিল। নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখাটি অত্যাচারপীড়িত রমণীর অটল হৃদয়ের মত অচলা ভক্তির সহিত তাহার স্বামীর স্মৃতি গৌরব রক্ষা করিতে লাগিল। গুরুচরণ দেখিতেছিল। বাতাস আসিল, গুরুচরণের বোধ হইল বাতাসের বেগেও প্রদীপ শিখাটি চঞ্চল হইল না।

বিলাসের অত্যাচার

যে রাত্রে গুরুচরণ প্রভৃতি নায়েব মহাশয়ের কাছারী বাড়ীতে মার খাইল তাহার পর দিন ভোরেই গ্রামের লোক দেখিল, কাছারী বাড়ী লোকে ভরিয়া গিয়াছে। সকলেই ত্রস্ত হইয়া উঠিল—গ্রামে আর একটা বুঝি মার ধর শীঘ্রই হয়।

যাহা হউক, ভাগ্যের জোরে মারধর কিছুই হইল না, কিন্তু লোকে দেখিল পাইক সকল মিলিয়া ভিন্ গাঁ হইতে অনেক গরুর গাড়ী লইয়া আসিতেছে। যাহারা কন্যাকার ব্যাপার কিছুই জানিত না, তাহারা গরুর গাড়ী লইয়া আসিবার কারণ শীঘ্রই জানিয়া লইল। পুলিস ও পাইকের তত্ত্বাবধানে ভয়ে গরুর গাড়ী সমস্ত চাউল বোঝাই হইয়া ষ্টেসনে যাত্রা করিল।

যাহারা বৎসর বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিতেছে, কর্দ্দম করিয়া এক হাঁটু কাদায় ডুবিয়া, লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আপনাদের দুই মুঠা অন্ন সংস্থান করিতেছে, ও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশের অর্থবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল সকলেরই যাহাতে পুষ্টি-বিধান হয় তাহার উপায় করিতেছে, তাহারা আজ ভগবানের অভিশাপে আপনাদের অন্ন সংস্থান করিতে পারিল না, তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আজ ভগবান্ বিফল করিয়া দিলেন; আর, সমাজ! তুমি যাহাদের শক্তিতে শক্তিমান্, তুমি তাহাদের প্রতি একবারও করুণাকটাক্ষপাত করিলে না! তুমি তাহাদেরই দেওয়া ধনে ধনী হইয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে! তাহারা তোমাদের ধন হইতে এক মুঠা অন্ন ভিক্ষা করিল, বলিল, সুদিন আসিলে তোমাদের তাহার শত গুণ ফিরাইয়া দিবে, তুমি তাহাও দিলে না! দিলে না, তোমার যাহাতে অন্ন-সংস্থান হয় তাহার জন্য নহে, তোমার স্বার্থের তাড়নায়, তোমার বিলাস উপভোগের জন্য! তোমার যাহাতে শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য নহে, অসংযম ও বিলাসিতার দ্বারা

তোমার শক্তি ক্ষয় করিবার জন্য। যাহারা চিরকাল তোমাকে শক্তি দান করিয়া আসিতেছে, তুমি বিলাসভোগে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের দুর্দ্দিনে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিলে না, বুঝিলে না যে তাহারাই শক্তির উৎস, তাহাদের শক্তি একবার হ্রাস পাইলে তোমার যে শুধু বিলাসিতা ও সৌখীনতা লোপ পাইবে তাহা নহে, তোমার জীবনসংশয় উপস্থিত হইবে। তুমি মূঢ় হইয়া আপনার বর্ত্তমান স্বার্থসাধন করিলে, দূর ভবিষ্যতের কথা একবারও চিন্তা করিলে না। আর ইহারা কি করিল? একবার বিস্মিত হইয়া তোমার দিকে চাহিয়া রহিল, তোমার স্বার্থচিন্তা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, একবার তোমার পায়ে পড়িল, পায়ে পড়িয়া তোমাকে কত অনুনয় করিল; তুমি যখন শুনিলে না, আপনাদের অদৃষ্টকে দোষ দিতে দিতে অনশন ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল।

ধিক্ এমন সমাজে! এমন সমাজের স্বার্থানুসন্ধানে ধিক্! তাহার বিলাসিতায় ধিক্! আমি এমন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, জীবনপণ করিয়া ইহার স্বার্থকে বিনাশ করিব; আর যাহারা মূঢ় অসহায়, আপনাদের শক্তি পরকে দিয়া অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে বল দিব, মনে তেজ দিব, বাহুদ্বয়ে আশার শক্তি দিব। তাহাদের দুর্ব্বলতা দূর করিব।

সে ভাবিতেছিল। গরুর গাড়ীগুলা দূরে ধূলা উড়াইয়া চলিয়া গেল, ধূলা আসিয়া তাহার ললাটে বিঁধিল। যেন শত

শত লোকের ক্ষুধার তাড়না তাহাকে ধিক্কার দিয়া গেল। গরুর গাড়ীগুলা শব্দ করিতে করিতে গেল, চাকা গুলার সরু অথচ উচ্চধ্বনি তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিয়া গেল—যেন শত শত লোক অত্যন্ত কাতরতাব্যঞ্জক কণ্ঠে তাহাদের জীবন রক্ষা করিতে বলিয়া পায়ে পড়িয়াছে, আর গাড়ীগুলা ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তাহাদের বক্ষপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উপর দিয়া চলিয়া গেল! শুনা গেল শুধু তাহাদের করুণ আর্ত্তনাদ! তাহার চক্ষে ধূলা পড়িল। সে আঁধার দেখিল। জল পড়িল, আর সে দেখিতে পারিল না।

কে এমন করিয়া ভাবিতেছিল? সে আমাদের দেবিদাস ছাড়া আর কেহ নহে। দেবিদাস কেলোর বাড়ী হইতে আসিবার সময়ে রাস্তায় এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হৃদয় লইয়া বাটী পৌছিল।

একা না সকলে

দেবিদাস বাটী যাইয়া দেখিল, দুইটী টেলিগ্রাম তাহার নামে আসিয়াছে। পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাম খুব কমই আসে, আসিলে গ্রামে একটা ছোট খাট আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবিদাস স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড লইয়া টেলিগ্রাম দুইটা খুলিল, তাহা

পড়িয়া সে অবাক্। একবার ভাল করিয়া খামের শিরোনামটা পড়িয়া লইল, দেখিল তাহার নামেই আসিয়াছে। একটাতে লেখা আছে—আমরা কয়েক জন ছাত্র আপনার দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য আসিতেছি, সঙ্গে চাউলও আনিতেছি। দ্বিতীয় টেলিগ্রামটি খুলিয়া দেবিদাস একটু আশ্বস্ত হইল। বিশ্বম্ভর বাবু টেলিগ্রামটি করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, "আমি দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে তোমার নামে আজ হাজার টাকা পাঠাইলাম। আশা করি, ইহাতে তোমার সেখানে কিছু হবে।"

দেবিদাস চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সে ঠিক করিতে পারিল না, বিশ্বম্ভর বাবু ইহার মধ্যেই কি করিয়া খবর পাইলেন যে গ্রামে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহাকেই বা টাকা পাঠাইলেন কেন; এবং আর কয়েক জন অপরিচিত ব্যক্তি না জানিয়া শুনিয়া তাহার নিকট হঠাৎ আসিতেছে কেন। দেবিদাস সকাল সকাল স্নান আহার করিতে গেল। স্নানের সময়ে দেবিদাস সিধুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সিধু তুই চাউল বিক্রী করতে পারবি?

সিধু কহিল—হাঁ বাবু—তা কেন পারব না? এখানে চাল কোথায় যে কিনে বিক্রী হতে পারে?

দেবিদাস কহিল—চাল কলকাতা হতে আসছে, তুই বিক্রী করতে পারবি ত?"

সিধু কহিল—হাঁ বাবু, আপনি দেখবেন।

হৈমী নিকটে ছিল, সে ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দাদা, তুমি চালের দোকান খুলবে কেন?

দেবিদাস কহিল—যে চাল আক্রা হয়েছে আমি সস্তা করে বিক্রী কর্‌ব—লোকে দুবেলা খেতে পাবে।

হৈমী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকে দুবেলা খেতে পায় না?

দেবিদাস কহিল—হাঁ, খেতে পায় না, তুই জানিস নি?

হৈমী কহিল—"না, আমি জানি না ত।" কিছুক্ষণ সে নীরবে থাকিয়া তাহার পর কহিল, 'ঐ জন্য বুঝি সুধারা চাল নিয়ে যায়?'

দেবিদাস কহিল—হাঁ।

দেবিদাস স্নান আহার শেষ করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গেল। মাষ্টার মহাশয় ও সুধাংশু বাবু তখন দৈনিক কাগজ লইয়া, আলোচনা করিতেছিলেন। দেবিদাস ঢুকিতেই সুধাংশু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে তোমার কাজ কেমন?' দেবিদাস তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—'দেখুন এ কি কাণ্ড! দুইখানা টেলিগ্রাম এসে হাজির, এর মাথা মুণ্ডু কিছু নাই।"

সুধাংশু বাবু টেলিগ্রাম দুইটা পড়িয়া কোন কথা না বলিয়া তাহাকে সম্মুখের দৈনিক কাগজটা তুলিয়া আঙ্গুল দিয়া একটা জায়গা দেখাইলেন।

দেবিদাস পড়িতে লাগিল। সেটা সুধাংশু বাবুদের কাগ-

্রের একটা সম্পাদকীয় মন্তব্য। তাহাতে লেখা ছিল, কাঞ্চনতলা গ্রামের শ্রীযুক্ত দেবিদাস একজন অকৃত্রিম স্বদেশসেবক। কয়েকটী গ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। অসংখ্য লোক অর্দ্ধাশনে অনশনে রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবিদাস এই আসন্ন-দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রাম হইতে শস্য রপ্তানি বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি কুটীরে কুটীরে গমন করিয়া আসন্ন-মৃত্যু দেশবাসিগণকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহার লোকবল ও অর্থবল আবশ্যক। তাহা না হইলে তাঁহার সাধু চেষ্টা বিফল হইবে। আমরা জনসাধারণকে, এই অক্লান্তকর্ম্মা স্বদেশসেবককে সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়িয়া দেবিদাস বিস্মিত হইয়া হরিমোহন বাবুর দিকে একবার চাহিল। তাহার পর সুধাংশু বাবুকে বলিল, "আপনি করেছেন কি, আপনার জন্য আমি আচ্ছা বিপদে পড়লাম দেখছি।"

সুধাংশু বাবু কহিলেন, "না হে, তোমাকে এই কাজে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব বলেছিলাম। এ সব না করলে কি কোন কাজ সফল হয়? একা একা কি আজকালকার জগতে কেউ কাজ করতে পারে? কি বলেন মেজ দা'? সকলে মিলে মিশে পাবলিকে যে কাজ করবে তাই ত সফল হবে, অন্য সব বৃথা চেষ্টা—পণ্ডশ্রম।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন—তুমি কি বলতে চাও একা কোন কাজ হয় না?

সুধাংশু কহিল—কোন কাজ হবে না কেন? ঘর কন্না খাওয়া দাওয়া হবে, দেশের দশের কোন কাজ হবে না।

হরিমোহন বাবু কহিলেন—দশের কাজ করতে হলে যে দশ জনকেই কাজে যোগ দিতে হইবে তাহা আমি মনে করি না। একাই দশের কাজ, দেশের কাজ করতে পারা যায়।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম?

হরিমোহন বাবু কহিলেন—একটা কাজ সফল হবে কি না তাহা চরিত্রের উপরে নির্ভর করে। কাজ ত একটা বাহিরের জিনিস। মানুষের দেহের ভিতর যেমন প্রাণ, সেরূপ কাজের অন্তরতম প্রাণ, যেটা কাজকে তাহার সজীবতা দেয়, সেটা হচ্ছে লোকের চরিত্র। দশ জনে মিলে যদি একটা কাজ হয়, আর সেই কাজে যদি একজনেরও সেরূপ টান না থাকে তবে সে কাজ একদিনও টিকিবে না। তাই বলিতেছিলাম, কাজের মধ্যে আসল হচ্ছে চরিত্র, একজন লোক একা যদি একটা কাজ করে, আর মন প্রাণ দিয়ে কাজ করে, তাহার চরিত্র যদি সবল হয়, তবে সে কাজ সফল হইবেই।

দেবিদাস কহিল—আপনি যা বলেছেন তা ঠিক; কিন্তু সকলে মিলে কাজ করলে সকলকার চরিত্র পরস্পরের সাহায্যে উন্নতিলাভ করবার সুযোগ পায়। আর একা চরিত্র গঠন করতে অনেক দেরী হয়; যে দুর্ব্বল সে হয়ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম না করতে পেরে অবিলম্বে বিফল হয়।

হরিমোহন বাবু কহিলেন—তা সত্য, কিন্তু একা কাজ

করতে করতে, বাধা বিঘ্ন একাই অতিক্রম করতে করতে যে চরিত্রের গঠন হয় তাহা খুব দৃঢ় সুন্দর হয়, তাহা এমন একটা গভীরতা গাম্ভীর্য্য লাভ করে যাহা অন্য উপায়ে দুর্লভ; অন্য দিকে সকলে মিলে কাজ করলে পরস্পরের দেখাদেখি চরিত্রের উন্নতি হতে পারে সত্য; কিন্তু চরিত্রের অবনতিও সম্ভব। একটা হুজুগের ভাব, একটা নাম যশ কিনিবার আকাঙ্ক্ষা, সকলে মিলে কাজ করাতেই শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়ে।

সুধাংশু কহিল—সকলে মিলে কাজ করলে হুজুগ হয়, কিন্তু একা সে কাজই হয় না। একার উপর নির্ভর করেই আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা।

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—ভারতবর্ষ যে চিরকাল মানুষকে একাই কাজ করতে শিক্ষা দিয়াছে ইহা খুব সত্য। ভারতবর্ষ চিরকাল বলে এসেছে, তুমি একাই তোমার চরিত্র গঠন কর, সাধনার দ্বারা একাই তুমি উন্নতি লাভ করবে। আত্মার উন্নতির একমাত্র সহায় আত্মা। এত সহজভাবে এত স্পষ্টভাবে কোন দেশ এ কথা বলতে পারে নি। কিন্তু তা বলে বলতে পার না যে ভারতবর্ষ বহুর শক্তিকে অবজ্ঞা করেছে। ভারতবর্ষের সমাজগঠনটা একবার চিন্তা করে দেখলে বুঝবে সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে ভারতবর্ষ কিরূপ সমূহের শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিল। হিন্দু কোন কার্য্যই একা করত না। পরিবার জাতি সমাজ মিলিয়া প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন হইত।

বরং আমরা সমূহের শক্তির উপর বেশী ঝোঁক দিয়েছিলাম। ভারতবর্ষ এরূপে একের ও সমূহের শক্তির একটা সুন্দর সমন্বয় বিধান করতে চেষ্টা করেছিল। অনেক সময়ে সমূহের শক্তিটা প্রবল হয়ে দেশে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করেছিল, কিন্তু যতকাল এক সাধনামূলক ধর্ম্মের প্রভাব ছিল ততকাল তা করতে পারে নি। আজকাল ভারতবর্ষের সে শক্তি নাই। তোমরা ভাবছ দেশে সমূহ শক্তি হ্রাস পেয়েছে। শুধু তা নহে, সমূহ শক্তির ত হ্রাস হয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে একের শক্তিও হ্রাস পেয়েছে। ধর্ম্মের আন্দোলন ভিন্ন এই একের শক্তিকে কখনও উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না। ধর্ম্মের দ্বারা একের শক্তি বৃদ্ধি পেলে তখন সমূহের শক্তিরও উদ্বোধন হবে। আমার মনে হয় আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে একের শক্তি বৃদ্ধি না পেলে সমূহের শক্তি বৃদ্ধি পাবে না।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিল—পাশ্চাত্য সমাজে আমাদের মত ধর্ম্মের শক্তি নাই, তবুও সেখানে সমূহ শক্তি এত প্রবল হ'ল কেন?

হরিমোহন বাবু কহিলেন—ওটা আমাদের একটা মোহ। পাশ্চাত্য সমাজ চিরকাল একের শক্তিকেই পূজা করে এসেছে; পাশ্চাত্য সমাজ সমূহের শক্তিকে না মেনে একের শক্তির উপর নির্ভর করেছে। আর ওখানে যে সমূহ তোমরা দেখ, সে একটা সমষ্টি মাত্র তাহার আলাদা একটা অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার উপর নির্ভর করে পরমুখাপেক্ষী না

হয়ে কাজ করে, আবার পরস্পরের সহিত মিলে মিশেও কাজ হয় যখন ঐ মেলামেশাতে স্বার্থের সুবিধা ঘটে। আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সেই দেনা পাওনা চুকে গেলে অমনি একের সহিত সমূহের লোপ হয়। সমূহটার সৃষ্টি যেন একের তুষ্টি-বিধানের জন্য। সমূহের নিজেরই একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই। দেনা পাওনার একটা বোঝা পড়া করে সমূহ কাজ করছে, ইহাকে ত সমূহ কিছুতেই বলা যায় না। পাশ্চাত্য সমাজে যদি সমূহ শক্তিকে খুঁজতে হয় তবে মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে পাওয়া যাবে, অন্য কোথাও নহে। মধ্যযুগ সমূহের একটা প্রাণ ছিল, আলাদা একটা অস্তিত্ব ছিল, শুধু ব্যক্তির ছায়া ছিল না।

সুধাংশু ও দেবিদাস দুই জনেই মাষ্টার মহাশয়ের ভাবের উৎসাহ দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

সুধাংশু কহিল—আপনার সঙ্গে ত কথায় পারবার যো নাই। তাহার পর দেবিদাসের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, দেবিদাস বাবু, আপনি একের শক্তির উপর নির্ভর না করে সমূহের শক্তিকেই জাগাতে চেষ্টা করবেন। দেখবেন কাজটা আপনাপনি, হয়ে যাবে কোন ভাবনা থাকবে না।



পলে পলে

দেবিদাসের একটা ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, জগতে একটা বড় কাজ করিবে। এই জন্ম সে তাহার জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও ভগবানের গূঢ় উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিত। এই দুই দিনের ঘটনা বলিতে তাহার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। যখন সে প্রথম গাড়োয়ানদিগকে চাউল রপ্তানি বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছিল, তখন সে একা আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছিল। আজ ভগবান্ তাহার নিকট অর্থ পাঠাইয়াছেন; সে কাহারও নিকট অর্থ চাহে নাই, লোক চাহে নাই, ভগবান্ আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ম তাহাকে অর্থ ও লোক বলে বলীয়ান্ করিয়া দিলেন! ভগবান্ তাহাকে যে চালনা করিতেছেন এই চিন্তা করিয়া দেবিদাসের বেশ আনন্দ হইল। সে মনে মনে আপনাকে বলিল—আমার যে শক্তি আছে তাহার দ্বারা যতদূর পারি এ কাজটা সফল করে তুলতে হবে। তাহার কোন সন্দেহই রহিল না যে, যে কাজটায় ভগবান্ তাহাকে নিয়োগ করিতেছেন, তাহা কখনও বিফল হইতে পারে।

' সকাল হইতে হরিমোহন বাবুর বাটীতে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। কলিকাতা হইতে পাঁচ জন ছাত্র আসিয়াছে; তাহারা ১০০০৲ মন চাউল সঙ্গে আনিয়াছে। দেবিদাসের বাড়ীতে স্থানাভাব। তাই সকলেই হরিমোহন বাবুর

বাড়ীতে উঠিয়াছে। সিধু পূর্ব্বেই দেবিদাসের আদেশক্রমে বাজারে একটা ঘর ঠিক করিয়াছিল, দেবিদাস সেই ঘরে ৩০০৲ মন চাউল সিধুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিল। তাহাকে ঐ চাউল টাকায় দশ সের দরে গ্রামবাসীদিগের নিকট বিক্রয় করিতে বলিয়া বাকী ১০০৲ মন দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামসমূহের দিকে লইয়া যাইবার জন্য বাজার হইতে গাড়োয়ান ঠিক করিয়া গাড়ী বোঝাই করিতে আদেশ দিল। তাহার পর সে হরিমোহন বাবুর বাটীর দিকে গেল। ইতিমধ্যে পৌছাইয়াই ছাত্রেরা সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতেছে, গ্রামে কি উপায়ে এখন কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, তাহাদের মধ্যে কে কত পরিশ্রম করিতে পারে, ম্যাজিষ্ট্রেটের এ বিষয়ে সহানুভূতি আছে কিনা, কলিকাতায় কোন্ নেতা চাঁদা সংগ্রহ কার্য্যে অধিক পরিশ্রম করিয়াছেন ইত্যাদি। দেবিদাস পৌছিলে তাহারা উহার নিকট গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ শুনিল।

কেবল মাত্র আট দশ খানা গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া গেল। দূরের গ্রাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। ঠিক হইল এই কয়টী গ্রামেই আপাততঃ যাইয়া পরিশ্রম করিতে হইবে।

গত বৎসর হইতে এই সমস্ত গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। গত বৎসর বর্ষায় এমন বৃষ্টি হইল যে জমিতে ফসল পচিয়া গেল। লোকে সব বেশী সুদ দিয়া টাকা ধার

করিয়া জমিদারের খাজনা দিল। এবারে সেরূপ বৃষ্টি হইল না, আশ্বিন কার্ত্তিকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নাই—লোকে তখন হতে একটা ভীষণ দুর্ভিক্ষের ভয়ে ত্রস্ত হইতে লাগিল। যাহা কিছু চৈতালী পাওয়া গেল তাহা জমিদারের নায়েব ঘরে ঘরে কটা যমদূতের মত পাইক পাঠাইয়া সঞ্চয় করিয়া লইল। কৃষকেরা জমিদারের খাজনা সব শোধ করিয়া দিল, কিন্তু তাহাদের নিজেদের উদর পূরণের জন্য কিছু রাখিল না। অনেকে আবার বীজ ধান্য পর্য্যন্ত দিয়া জমিদারের খাজনা শোধ করিল। জমিদারের নায়েব চাউলের ব্যবসা করে। এই দুর্দ্দিনে কিছুমাত্র চাউল কাছারী বাড়ীর গোলায় সঞ্চয় না করিয়া একবারে সমস্তই চালান করিয়া দিল। এখন গ্রামের দোকানে চাউল নাই বলিলেও চলে, এত অল্প আছে ও এত তার দাম হইয়াছে, লোকে কেউ একবেলা, কেউ আধ পেটা খাইতেছে। তাহার পর এখন এই গ্রামের অবস্থা বরং কিছু ভাল। পার্শ্বের গ্রাম—কলাভাঙ্গা, কুলবেড়িয়া, সরিষাবাদ, ভগীরথপুর, গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতিতে লোকে বলদ বেচিয়াছে, লাঙ্গল বেচিয়াছে, আর সকাল সন্ধ্যা উপবাস করিতেছে। প্রথমে বনকচুর মূল আর পুকুরের কলমী শাক, শুষনী শাক সংগ্রহ করিয়া লোকে খাইতে আরম্ভ করিল। ভোর রাত্রি হইতে দলে দলে লোক বাহির হইয়া পুকুরে সাঁতার দিয়া জল ঘোলা করিয়া শাক সংগ্রহ করিতে লাগিল বন জঙ্গলে; যেখানে কচু আছে তাহা অন্বেষণ করিয়া খাইতে লাগিল। তাহার পর

শাক কচুও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। অনেক পেট—গ্রামের শাক কচু পর্য্যন্ত ফুরাইয়া গেল। তাহার পর লোকে ঘাস ও গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিল। তেঁতুলপাতা আর ঘাসের বোঁটা তখন একমাত্র খাদ্য হইল। এদিকে লোকে কয়েকদিন অনাহারে কাটাইতেছে, আবার অনাহারের পর অখাদ্য বেশী পরিমাণে খাইয়া ফেলিতেছে; সুতরাং পেটের অসুখ আরম্ভ হইল। ঘরে ঘরে ওলাউঠা হইতে লাগিল। প্রথম কয়েক দিন রাস্তায় শ্মশানের দিকে সারি সারি লোক মড়া লইয়া যাইতেছে, মেলায় যেমন লোক যায় সেরূপ। দুজন করিয়া লোক শব বাঁধিয়া মৃতদেহ কাঁধে করিয়া শ্মশানে চলিতেছে। শ্মশান হইতে চাঁড়ালরা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে। লোকেরা মৃতদেহ সেখানে লইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি কোন রকমে পুঁতিয়া দিয়া পলাইয়া আসিতেছে। গৃহে পৌঁছিয়া তাহাদের আবার ওলাউঠা হইতেছে, আবার তাহাদিগকে লইয়া গৃহের অন্য লোক আসিতেছে। গৃহে যদি দুই একজন লোক থাকে, তাহা হইলে মৃতদেহ ফেলিয়া তাহারা অন্য কোন লোকের পরিত্যক্ত গৃহে আশ্রয় লইতেছে। তখন মৃতদেহ ঘরে পচিতেছে। লোক থাকিলেও অনেক সময়ে মৃতদেহ ফেলিতেছে না। রাস্তায় শ্মশানে মৃতদেহ লইয়া যাইতে যাইতেই লোকের ওলাউঠা হইতেছে। শ্মশানের পথে ওলাওঠা হইল, ও পথেই মরিল। কে কাহাকে ফেলিবে? পতির ওলাউঠা হইয়াছে, সাধ্বী স্ত্রী তাহাকে সেবা করিতে করিতে তাহারই বিছানায় ওলাউঠা হইয়া শুইয়া

পড়িল, দুই জনেই জড়াইয়া এক সঙ্গে মরিল। তাহাদের শিশু পুত্রকে দেখিবার আর কেহ রহিল না, সে অনাহারে তাহাদের পায়ের তলে মরিল। কোথাও মাতার ওলাউঠা হইয়াছে, শিশু পুত্র তাকে জল দিতে গিয়া বুকে চিরকালের জন্য আশ্রয় লইল। আবার কোথাও কেহ কাহারও মুখে জল দিতেছে না, কেহ কাহারও নিকট থাকিতেছে না, পুত্র মাকে ফেলিয়া পলাইতেছে, স্বামী স্ত্রীকে ফেলিয়া পলাইতেছে। ভ্রাতা ভগ্নীকে জল দেয় না, পিতা কন্যাকে স্পর্শ করে না। এখন আর আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশী কেহ নাই, রোগীর ঘরে উঁকি মারিবার পর্য্যন্ত লোক নাই। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মাতা মৃত্যুকালে একবিন্দু জল চাহিল—কোথায় পুত্র! ঘরের চারিদিকে একবার তাহাকে কাতর চাহনিতে খুঁজিয়া তাহার পর চক্ষু মুদিল। সাধ্বী স্ত্রী চিরকাল স্বামীর সেবা করিয়া আসিয়াছে,—তাহার রোগ সারিল,—কোথায় স্বামী, কোথায় স্বামী! সে যে একমুঠা খাইতে পেলে বাঁচে, সে অনাহারে মরিল। স্বামীর চরণে সে মাথা রাখিয়া মরিতে পারিল না বলিয়া একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার জীবন মরণের শেষ আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া গেল। ছোট ভগ্নী শৈশবে ভ্রাতার সহিত খেলা করিয়াছে, বিবাহের অল্পদিন পরেই স্বামী হারাইয়া চিরকাল ভ্রাতার ঘরকন্না দেখিতেছে, আজ মৃত্যুশয্যায় সে জানাইতে চাহিল, শৃগাল কুকুরেরা যেন তাহার দেহ স্পর্শ না করে—কোথায় ভ্রাতা! তাহার সদ্গতি হইবে না,

এ অক্ষেপ রুদ্ধ ঘরের দেওয়ালে বাধা পাইয়া তাহারই নিকট ফিরিয়া আসিল।

আবার কোথায় কি বীভৎস গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ বিশুষ্কমাংস অস্থিপঞ্জরসার উলঙ্গ কতগুলা মানুষ একস্থানে পড়িয়া আছে! তাহাদের চক্ষুগুলা কোটরের ভিতর হইতে কি ভয়ানক দেখাইতেছে! কিন্তু যখন তাহারা শীর্ণ হস্তের দীর্ঘ ও শুষ্ক অঙ্গুলীর দ্বারা পরস্পরের নিকট আপনাদের মৃত্যু সন্নিকট সঙ্কেত করিয়া জানাইল, তখন তাহাদের চাহনি কি কাতরতা-ব্যঞ্জক ছিল! অদূরে কঙ্কালসার মাতা শিশু পুত্রকে বুকে ধরিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে, পুত্র ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর; মাতার শুষ্ক স্তনে এক ফোঁটা দুধ নাই, মা বুক চিরিয়া একটু রক্ত দিতে পারিলে আশ্বস্ত হয়, আর সেই সময়ে এক দল শৃগাল কুকুর একটা হাড় লইয়া কামড়া কামড়ি করিতে করিতে নিকটে আসিল—শিশু পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া একটা শৃগাল ছুটিয়া আসিল, মাতার স্তন হইতে তাহাকে মুখে করিয়া ছিঁড়িয়া লইল! মাতৃস্নেহ বুকের ধনকে রক্ষা করিতে পারিল না, অনাহারে রোগে দেহ এত দুর্ব্বল এত অকর্ম্মণ্য! দেহে বল নাই, কিন্তু চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ছিল, আর হৃদয়ও ছিল; হৃদয়ের বৃত্তিগুলি নির্ম্মূল হয় নাই। মাতৃস্নেহ ছিল, মা ছিল না! হায় মাতৃ-স্নেহের উপর কি ভয়ানক বজ্রাঘাত! লোকে বলে দুর্ভিক্ষে মানুষ পশুভাবাপন্ন হয়। তাহা নহে, মানুষ জড় হয়, তাহার দেহটা শুষ্ককাঠের মত অচেতন হয়, কিন্তু তাহার মন তবুও

সজীব থাকে, মনের ভিতর কোমল প্রবৃত্তির সঞ্জীবনী রসধারা বহিতে থাকে, মৃত্যু পর্য্যন্ত বৃত্তিগুলার বিনাশ হয় না। তাই ত আরও দুঃখ, আরও বেদনার কথা। আমি মানুষ রহিয়াছি, আমার স্নেহ, প্রেম, দয়া করুণা সবই রহিয়াছে, আর আমি আমার কার্য্যে একবারেই সম্পূর্ণ দয়া-স্নেহ-মমতা শূন্য! হৃদয়ে কি ভয়ানক একটা তোলপাড় হয়, বৃত্তিসমূহের কি একটা ভীষণ বিপ্লব হয়! দুর্ভিক্ষ সময়ে হৃদয়টা মনুষ্যের হৃদয় থাকে বলিয়াই দুর্ভিক্ষটা এত নিদারুণ!

উঃ—অনাহারে শীর্ণ মাতা তাহার পুত্রকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখিবে বলিয়া বুকে রাখিয়াছে, আর তাহার নিকট বন্য পশু আসিয়া পুত্রকে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল এবং অদূরে তাহার দৃষ্টি পথের মধ্যেই টুকরা টুকরা করিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়া ফেলিল! জগতে ইহা অপেক্ষা নিদারুণ কি হইতে পারে?

হাজার লোক এক সঙ্গে জাহাজডুবিতে মরিল। মৃত্যু হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। এ মৃত্যুতে একটা মাধুর্য্য একটা উন্মাদনা, একটা ঔদাসীন্য থাকিতে পারে। হাজার লোক দুর্ভিক্ষে মরিতেছে। ইহাত এক সঙ্গে মৃত্যু নহে। দুর্ভিক্ষের মৃত্যুতে বিচ্ছেদ আছে, জাহাজডুবির মৃত্যুতে বিচ্ছেদ নাই। মৃত্যুটাই সেখানে মিলন। আর দুর্ভিক্ষের মৃত্যু পলে পলে মৃত্যু, জাহাজ ডুবিবার মত এক পলের

মৃত্যু সহে। মৃত্যু নিশ্চিত, পলে পলে বিচ্ছেদ বেদনা, পলে পলে স্নেহ মমতার উপর নিদারুণ আঘাত, প্রত্যেক পলে নূতন মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, না করিলে দুর্ভিক্ষের মৃত্যু হয় না। জাহাজডুবিতে মৃত্যু হইল। একটা প্রকাণ্ড কবর সকলেরই জন্য হইল, স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা পুত্র, হাত ধরিয়া কবরে গেল—বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কাহাকেও সহ্য করিতে হইল না, আবার কবরের পর অনন্ত মিলনের সুখ। দুর্ভিক্ষের মৃত্যুতে শ্মশানের চিতা প্রত্যেক হৃদয়ে জলিয়া উঠিল। দেহ সবল, মন সতেজ থাকিতেই সে চিতা জলিল, দেহ ও মন পলে পলে চিতায় পুড়িতে লাগিল, স্নেহ ও প্রেম সে দাহজ্বালা নিবারণ করিল না, বরং স্নেহ ও প্রেমের অভিশাপ সে জলন্ত চিতায় ঘৃতাহুতি দিল! চিতার আগুন পলে পলে দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ও হৃদয়ের প্রত্যেক বৃত্তিকে দগ্ধ করিতে লাগিল— জীবন থাকিতে মৃত্যু ও বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, এবং জীবনের পরপারে স্নেহের ও প্রেমের মধুর সম্ভাষণ নহে, তীব্র অভিসম্পাত। অনন্ত মিলন নহে, অনন্ত বিচ্ছেদ!

দুর্ভিক্ষের মৃত্যুযন্ত্রণা অসীম যন্ত্রণা। ভগবান্ আমাদের দেশবাসিগণের হৃদয়ে অসীম স্নেহ, অসীম প্রেম, অসীম ধৈর্য্য দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অসীম স্নেহ, প্রেম, ধৈর্য্যকে লাঞ্ছনা দিবার জন্য অসীম মৃত্যুযন্ত্রণাও দিয়াছেন।

কলিকাতার ছাত্র গুলির চক্ষের সম্মুখে দুর্ভিক্ষ মহামারীর সেই করুণ দৃশ্য, সেই ভীষণ দৃশ্য, একে একে

দেখা দিল। তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তাহারা ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল, তাহাদের শিরায় শিরায় রক্ত-প্রবাহ ছুটিল, তাহাদের হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। একটা গভীর মর্ম্ম বেদনায় তাহারা পীড়িত হইল।

ছাত্রগণের মধ্যে বীরেন বলিয়া একটী ছাত্র কহিল—চলুন, আর সময় নষ্ট করে কি হবে?

তাহার করুণ ও কোমল কণ্ঠ অন্য সকলের নীরব বেদনাকে আরও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিল।

দেবিদাস জিজ্ঞাসা করিল—এখনি যাবেন?

সকলেই কহিলেন—হাঁ চলুন।

হরিমোহন বাবু এতক্ষণ ছিলেন না, সুধাংশু বাবু কলিকাতার ছাত্রবৃন্দের আগমনবার্ত্তা সম্বন্ধে তাঁহার কাগজে একটা লম্বা মন্তব্য লিখিতেছিলেন।

হরিমোহন বাবু এক্ষণে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা হাত পা ধুয়েছেন? রান্না হয়ে গেল বলে।

রমেশ ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়; সে কহিল—না আমরা আর থাকতে পারছি নি, এখনি যাব, ঠিক করেছি। তাহার কণ্ঠ একটু গভীর ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল।

হরিমোহন বাবু তাহার উপর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি অন্তরে ইহাদের ব্যগ্রভাব দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

দেবিদাস ও আর সকলে উঠিয়া পড়িল। এমন সময়ে

সুধাংশু বাবু আসিলেন—এই যে আপনাদের সম্বন্ধে একটু লিখে এলাম; আপনারা এখন উঠলেন যে?

তৃতীয় ছাত্র চিত্তরঞ্জন কহিল—"হাঁ আমরা এখনি আমাদের সব জিনিস্ লইয়া যাচ্ছি।" সুধাংশু বাবু কহিলেন—"সে কি মশায়, বসুন একটু, বিশ্রাম করুন, খেয়ে টেয়ে নিন, তবে যাবেন।"

তাঁহার বিস্ময়ে বিরক্ত হইয়া চিত্তরঞ্জন মুখের উপর উত্তর দিল—"বেশ মশায়! আচ্ছা আপনি দেখছি—লোকে এক মুঠা খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে, আর আমরা আপনার এখানে আরাম করব, আর ফলার খাব, এরই জন্তে যেন এতদূর থেকে এসেছি!" বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

হরিমোহন বাবু তাহাদের কহিলেন—আচ্ছা আসুন আপনারা, মাঝে মাঝে খবর দিবেন। সকলে চলিয়া গেল।

সুধাংশু বাবু কহিলেন—ছেলেরা ক্ষেপেছে দেখ্ছি। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

মৃত্যু ও প্রেম

বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে দেবিদাস, রমেশ, বীরেন ও চিত্তরঞ্জন পথ হাঁটিয়া চলিতেছে। সূর্য্যের তাপে পৃথিবীতে যেন আগুন লাগিয়াছে। বাতাস খুব জোর বহিতেছে।

সাদা ধূলা উড়াইয়া, তাহাদের মুখে চোখে আগুন ছুটাইয়া, বাতাস তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া খুব ছুটিতেছে। পথের আশে পাশে ছায়া দিবার মত গাছ নাই। দুই ধারে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। মাঠে ঘাস নাই, যাহা ছিল তাহা শুকাইয়া খড় হইয়া গিয়াছে। মাঠের উপরও ধূলা উড়িতেছে। সূর্য্যের রং একবারে সাদা। সমস্ত দিগ্মণ্ডলও একটা পাংশু সাদা রং ধারণ করিয়াছে। রাস্তা সাদা, দুই পার্শ্বের মাঠ সাদা, আকাশ সাদা। সবুজ রং প্রাকৃতিক জগতের জীবনের লক্ষণ, হলদে রং প্রাণিজগতের জীবনের লক্ষণ, আর সাদা রং প্রাকৃতিক ও প্রাণিজগতের মৃত্যুর লক্ষণ। কোথায়ও সবুজ গাছ পালার সরস জীবনের লক্ষণ নাই, কোথায়ও প্রাণিজগতের কোন নিদর্শন নাই—শুধুই সাদা! শুধুই সাদা—স্বয়ং রুদ্রদেব পৃথিবীময় আপনার দেহের রং বুলাইয়া দিয়াছেন। পথ, মাঠ, স্তব্ধ হইয়া আকাশে প্রলয়ঙ্করের রোষ-উদ্দীপ্ত চক্ষু নিরীক্ষণ করিতেছে, কখনও বা দিগন্তে আকাশের সম্মুখীন হইয়া ভয়ে কাঁপিতেছে। থাম রুদ্রদেব, ওগো থাম—বলিয়া দিগন্তে পৃথিবী একটা উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—সেই দীর্ঘ নিশ্বাসটা প্রথমে নরলোকে ব্যাপ্ত হইয়া ধূলা উড়াইয়া শুষ্ক তৃণকে উড়াইয়া দেবিদাস ও তাহার সঙ্গীগণের মুখ দগ্ধ করিয়া, তাহার পর শূন্য মার্গে প্রলয়দেবের উদ্দেশে ছুটিল!

দূরে একটা আমলা গাছ ছিল। তাহার ছায়া ছিল না বলিলেই হয়। সেইখানে দেবিদাস প্রভৃতি কিছুক্ষণ

বসিল। নিকটে কোথায়ও জল নাই। পুষ্করিণী সব শুষ্ক, পুষ্করিণীর মাঝখানে একটু সিক্ত; তাহা জল নহে কাদার চিহ্ন। তাহারা জল পাইল না। আবার চলিল। দূরে রাস্তার শেষ সীমানায় তাহাদের তিন চারি খানা গাড়ী চাউল, চিঁড়া ও জল লইয়া আসিতেছে, দেখিয়া চলিল।

কোথায় গ্রাম, কোথায় মানুষ! ঘর রহিয়াছে, ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে, শুধু মানুষ থাকিলেও তাহার সাড়া শব্দ করিবার শক্তি নাই। সেই শব্দহীনতা তাহাদের হৃদয়ে নিদারুণ ভাবে আঘাত করিল। যে দিকে অনেকগুলি ঘর দেখা যাইতেছে তাহারা সে দিকে চলিল। রাস্তার দুই ধারে বাড়ী, তাহারা সেই রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কোন শব্দ শুনিতে পাইল না! একটা দরজা খুলা ছিল; তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল একটা তামসঘন ভীষণ শূন্যতা তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিল। আর একটা দরজা খুলা ছিল, একটা গলিত শব পড়িয়া রহিয়াছে, একটা শিশুর মৃতদেহ গলিত অঙ্গুলির দ্বারা আঁকড়াইয়া রহিয়াছে! সে ভয়ানক দৃশ্যেও সেখানকার পূতিগন্ধে তাহারা শিহরিয়া উঠিল। সে স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া তাহারা অগ্রসর হইল। দুই একটা শীর্ণ কুকুর ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। অবাক্ হইয়া ইহাদিগকে দেখি[illegible] লাগিল, ইহারা মৃত কি জীবন্ত তাই অনুমান করিতে-[illegible] কে কাহাকে এখন সেবা করিবে? অন্নদাতা আসি-

য়াছে, অন্ন লইবার লোক নাই। অন্নের অভাব নাই, কিন্তু খাইবার লোকের অভাব। পিপাসার জল আসিয়াছে, পিপাসাতুর নাই। ঔষধ আসিয়াছে; ঔষধ সেবন করিবার লোক নাই। চিকিৎসক আসিয়াছে, রোগ নাই। শুশ্রূষা করিবার লোক আসিয়াছে, শুশ্রূষা লইবার লোক নাই। নাই, নাই, নাই, তবুও তাহারা চলিল। একটা শৃগাল একটা মুদীর দোকান হইতে বাহির হইয়া বলিয়া গেল—'নাই', তবুও তাহারা চলিল। কয়েকটি শকুনি বাজারের চালায় বসিয়া কর্কশ স্বরে বলিল 'নাই', তবুও তাহারা চলিল। পূতিগন্ধময় বাতাস তাহাদের কাণে কাণে বলিয়া গেল—'নাই', 'এখানে এস না'—তবুও তাহারা চলিল। তাহারা শুনিতে লাগিল, বলিল 'আছে, এখনও আছে'। মাঠ, ঘর, বাতাস, আকাশ বলিতেছে 'নাই',—রুদ্রদেব স্বয়ং বলিতেছেন 'নাই'—ইহারা বলিতেছে 'আছে'। মৃত্যু বলিতেছে—নাই, প্রেম বলিতেছে—আছে। মৃত্যু গতিরোধ করিতেছে, প্রেম বাধা ভেদ করিয়া চলিতেছে।

গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিতে করিতে তাহারা চলিল। শেষে এক গ্রামে তাহারা মৃত্যুর লীলার আতিশয্য দেখিল। শৃগাল, কুকুর, শকুনি সকলে মিলিয়া একটা বীভৎস শব্দ করিতেছে। তাহারা চলিতে লাগিল—দেখিল, কয়েকটা শবদেহ লইয়া শৃগাল, কুকুর ও শকুনি কাড়াকাড়ি করিতেছে। আবার কিছু দূরে অনেক গুলি শব পড়িয়া রহিয়াছে, শৃগালেরা

স্বচ্ছন্দে আহার করিতেছে, কাড়াকাড়ি করিতেছে না! আবার শকুনিরা তৃপ্তিলাভ করিয়া আহার পরিত্যাগ করিয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে। তাহাদের বোধ হইল, এই গ্রামের অধিবাসিগণের মৃত্যু বেশী দিন হইল হয় নাই। তাহারা আরও চলিতে লাগিল। সম্মুখে একটা জঙ্গল দেখিল। গাছপালা গুলার ভিতর দিয়া এখনও রস প্রবাহ বন্ধ হয় নাই। গাছ পালা গুলা এখনও শুষ্ক হয় নাই, কিন্তু শুষ্কপ্রায়। তাহারা একটা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। যতই ভিতরে ঢুকিল, ততই তাহারা গাছপালার সজীবতা লক্ষ্য করিতে করিতে চলিল। শেষে একটা গ্রামে পৌছিল। গ্রামের কয়েকখানি ঘর দেখা যাইতেছে। দূর হইতে তাহারা এক স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিতে পাইল। তাহারা পথশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, তাহাদের দ্রুতপদে হাঁটিবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না। কিন্তু এই ক্রন্দন শুনিয়া তাহাদের মর্ম্মের ভিতর দিয়া একটা সঞ্জীবনী শক্তি খেলিয়া গেল, কে তাহাদিগকে বলিয়া গেল—আছে, আছে, এখানেই আছে! কে তাহাদিগের হৃদয়ে বল দিল, দেহে শক্তি দিল! তাহারা কথা বলিল না, এক সঙ্গে ছুটিতে লাগিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া তাহারা ছুটিল। শেষে পৌছিল। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে একজন বলিয়া উঠিল,—'আমরা এসেছি মা!' যেন মা কতকাল তাহার বিরল কুটিরে বসিয়া তাহাদিগকে ডাকিতেছে, কত অশ্রুপাত করিতেছে, কত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, অন্নাভাবে

ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ডাকিতেছে, পিপাসাতুর হইয়া তাহাদিগকে ডাকিতেছে, রোগপীড়িত হইয়া মৃত্যু শয্যায় তাহাদিগকে ডাকিতেছে!—মৃত্যু প্রেমকে ডাকিতেছে—'প্রেম, তুমি আমাকে অমৃত পান করাও।' তাহারা সকলে মিলিয়া বলিল—'আমরা এসেছি মা'—তখন গাছ পালার ভিতর দিয়া একটা স্নিগ্ধ বাতাস আসিয়া বলিয়া গেল—'আছে—আছে।'

সেই গ্রামেই তাহারা তাহাদের রোগশুশ্রূষা, অন্নদান, জলদান আরম্ভ করিল। তাহার পর ঐ গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আশে পাশে অন্নছত্র খুলিল। গৃহে গৃহে যাইয়া নিরন্নকে অন্ন দিতে লাগিল, তৃষ্ণার্ত্তকে পিপাসার জল পান করাইতে লাগিল, রোগীকে ঔষধ দান করিয়া সেবা করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। মৃত্যুর রাজ্যে প্রেম জীবনসঞ্চার করিল, ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ মৃত্যুকে প্রেম এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। ধ্বংসের উপর প্রেমের প্রতিষ্ঠান হইল। রুদ্রদেব ধূসর আকাশ হইতে দীপ্ত চক্ষু মেলিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। অশ্বত্থ, বট গাছ তাঁহার রোষ কষায়িতনেত্র দেখিয়া হাসিল। তাহাদের হাসি প্রেমের জন্য স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া দিল। তাহাদিগকে দেখিয়া কপোতযুগল মৃত্যু দেবতাকে অবজ্ঞা করিল। ঘরের আঙ্গিনায় ফিরিয়া আসিয়া তাহারা প্রেমের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

বন্ধু

সুধাংশু বাবু এদিকে ছাত্রগণের দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে খবর দিতেছেন। বাংলাদেশে একটা তুমুল আন্দোলনের স্রোত বহিতেছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, কলেজে কলেজে, বৈঠকে বৈঠকে, উকিলের মহলে, হাকিমের এজলাসে, এমন কি সাহেবদের ক্লাবে পর্য্যন্ত, দুর্ভিক্ষ লইয়া আলোচনা হইতেছে, সর্ব্বত্রই ছাত্রদের উদ্যম প্রশংসিত হইতেছে। অর্থও সংগৃহীত হইতেছে, বিভিন্ন কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকগণের নিকট খবর লইতেছে, কোথায় অর্থ ও লোক-বলের অভাব। তাহারা পথে পথে ঘরে ঘরে যাইয়া অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে ও পাঠাইতেছে ও নিজেরা দল বাঁধিয়া সেই সব স্থানে যাইতেছে। দেবিদাসের নামে আরও কয়েক খান টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তখন দেবিদাস ও তাহার সঙ্গীরা খুব ব্যস্ত, টেলিগ্রামের উত্তর দেওয়া হয় নাই। তাহার পর সকলেই বুঝিল যে ভাবে তাহারা কাজ করিতেছে বেশী দিন সেরূপ করিলে সকলেরই শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। দেবিদাস জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, যাঁহারা এখানে দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কত দিন থাকিতে পারেন। কেহ পনের দিন ও এক মাসের অধিক থাকিতে পারিবে না জানাইল। অনেকে আবার সাত দিনেরও বেশী থাকিতে পারিবে না

টেলিগ্রাম করিল। দেবিদাস ইহাদিগকে অর্থ পাঠাইতে বলিয়া, আসিতে নিষেধ করিল। যাহারা এক মাস থাকিতে পারিবে জানাইয়াছিল, তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতে টেলিগ্রাম করিল। তাহারা আসিলে বীরেন ও চিত্তরঞ্জন ফিরিয়া আসিল। বীরেনের শরীর খুব দুর্ব্বল, সে আর থাকিতে পারিল না। চিত্তরঞ্জন বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, সে দেবিদাস ও রমেশের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিল না। তাহাকেও আসিতে হইল। দেবিদাস ও রমেশ কয়েক দিন থাকিয়া আপনাদের কাজ নবাগত ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিল। কয়েকটা হোমিওপ্যাথিক শিশি দিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজনকে ওলাউঠা রোগের চিকিৎসাও শিখাইয়া দিল। তাহার পর গ্রামবাসিগণকে তাহারা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফিরিল।

হরিমোহন বাবুর বাটীতে আসিয়া তাহারা দেখিল বীরেনের খুব অসুখ। খুব জ্বর ও জ্বরে প্রলাপ বকিতেছে। প্রলাপে একবার শৃগাল ও শকুনি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিতেছে, একবার 'আমরা এসেছি মা' বলিয়া চারিদিকে, কাহাকে খুঁজিতেছে, আবার 'আঃ বাঁচলাম' বলিয়া শান্ত হইতেছে। হরিমোহন বাবু তাহাদিগকে বলিলেন, এটা টাইফয়েড জ্বর, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দেবিদাস ও রমেশের খুব ভয় হইল, চিত্ত এ কয়দিন রাত্রি জাগিয়া খুব সেবা করিতেছিল। তাহাকে ছুটি দিয়া রমেশ ও দেবিদাস রোগীর নিকট বসিল। তাহারা

ইতিপূর্ব্বেই অনেক মুমূর্ষু লোকের সেবা করিয়াছে, কিন্তু বীরেনের পাশে বসিয়া তাহারা যেরূপ ভীত উদ্বিগ্ন হইতেছে এরূপ কখনও হয় নাই। এই কয়দিন তাহাদের মধ্যে যে শুধু একটা বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হইয়াছে তাহা নহে, বীরেনের কোমলতাপূর্ণ অন্তঃকরণ, সকলেরই প্রাণ একেবারে কাড়িয়া লইয়াছে। বীরেনের শরীর দুর্ব্বল, তবুও সে অক্লান্তভাবে অহোরাত্র সেবা করিয়াছে, আর চক্ষের জল ফেলিয়াছে; চক্ষের জল মুছিয়াছে, আবার কাজ করিয়াছে। দেবিদাস ও রমেশ তাহার সেই কোমলকুসুমসদৃশ মুখ মনে করিতেছিল, তাহাদের চক্ষের জল যেন সেই কুসুমকে শিশিরাভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহার এখনকার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ দেখিতে দেখিতে তাহারা হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছিল। চিত্তরঞ্জন বীরেনের কষ্ট দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া, হরিমোহন বাবুর বারাণ্ডায় গেল। সেখানে বাগানের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল, বীরেন এত ভাল—তার জীবনের উদ্দেশ্য এত মহৎ—তাহার প্রতি ভগবানের এত কোপ কেন? কোন লোক তাহার মহৎ কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে, ভগবান্ তাহাকে দুঃখ দিয়া আবার সৎপথে প্রেরণ করেন। বীরেন তাহার কর্ত্তব্য পথ হইতে একচুল সরে নাই, তাহার প্রতি ভগবানের কোপ কেন? এই সব প্রশ্ন সে আপনার মনে করিতে লাগিল। তাহার পর সে নিজের কথা ভাবিল—আমি মহৎ উদ্দেশ্য অনুসরণ করিব নিশ্চয়। আমার বয়স যত, আমার বিদ্যাবুদ্ধি

সামর্থ্য তাহা অপেক্ষা কম। আমি তার মত বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন যে কখনও হতে পারব তাহা আশা করা অনুচিত। শেষে চিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল—ভগবান্ আমাকে লও, তাকে লইও না, আমি তাকে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহার বিনিময়ে আমি যাইব। তাহার চক্ষু দিয়া অবিরত জল পড়িতে লাগিল, বোধ হয় এই চক্ষের জলই ঔষধ হইল। প্রায় ১৪ দিন ১৪ রাত্রি দুর্ভাবনার পর রোগের একটু উপশম হইল। বীরেন সারিয়া উঠিতে লাগিল। দেবিদাস ও রমেশ প্রতিজ্ঞা করিল, বীরেনকে কখনও তাহারা আর এরূপ পরিশ্রমের কার্য্যে লইয়া যাইবে না। চিত্তরঞ্জনের মুখে হাসি দেখা দিল।

বীরেনের অসুখ কমিতেই দেবিদাস ও রমেশ গ্রামে গ্রামে অন্ন ও ঔষধ বিতরণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে যাইল। এক্ষণে দূর গ্রাম হইতে অনেক লোক খবর পাইয়া আসিতেছে এবং রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য একটা স্থায়ী চিকিৎসালয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। অনেক লোক চিকিৎসালয়ে থাকিয়া ঔষধ ও শুশ্রূষা পাইতেছে, যাহারা দুর্ভিক্ষে আপনাদের আত্মীয় স্বজন সব হারাইয়া, একবারে নিরাশ্রয় হইয়াছে, তাহাদিগকে ঐ বাসস্থানের সুবিধা দেওয়া হইতেছে। কতকগুলি বালক বালিকা, যাহারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, তাহারা এক্ষণে সেখানে থাকিয়া ছাত্রগণের যত্নে ও স্নেহে পালিত হইতেছে। সুধাংশু বাবু তাঁহার কাগজে অর্থ-সাহায্যের জন্য একটা নিবেদন লিখিয়াছেন, তাহার জন্য খুব অর্থ সংগৃহীত

হইতেছে। তাহাতে ঐ চিকিৎসালয় ও বাসস্থানের খরচ চলিতেছে। তাহা ছাড়া প্রত্যহই দূর গ্রাম হইতে আগত দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে চাউল বিতরণ করা হইতেছে। এইরূপে কাজ বেশ চলিতে লাগিল।

সিধু টাকায় দশসের চাউল বেচিতেছে, সুতরাং দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে কাঞ্চনতলা গ্রাম রক্ষা পাইল। কিন্তু এক বিপদ না যাইতে যাইতে আর এক বিপদ আসে। চারিপার্শ্বের গ্রামে খুব ওলাউঠা হইতেছিল, কাঞ্চনতলাতেও শেষে ওলাউঠা দেখা দিল।

চরণামৃত

চিত্তরঞ্জনকে এখনও বীরেনের নিকট বসিয়া থাকিতে হয়, বীরেন এখনও এত দুর্ব্বল। সুতরাং দেবিদাস ও রমেশ ভিন্ন আর কেহ নাই। তাহারা ঘরে ঘরে ঔষধ লইয়া রোগীদিগকে চিকিৎসা ও সেবা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্রমেই রোগীদের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেবিদাস ও রমেশ রোগী দেখিয়া উঠিতে পারিতেছে না। চিত্তরঞ্জনকে শেষে তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে আসিতে হইল। দেবিদাস ও রমেশের ঔষধ ও সেবার গুণে এতদিন কোন লোকই মারা যায় নাই। শেষে দক্ষিণ পাড়ায় ওলাউঠা আরম্ভ হইল।

প্রথমেই কেলোর স্ত্রীর ওলাউঠা হইল। এই বার ওলাউঠা খুব ভীষণ রকমে দেখা দিল। কেলোর স্ত্রী তিন ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেল, দেবিদাস ও রমেশের চিকিৎসা ও সেবা ব্যর্থ হইল। কেলোর স্বজাতি কতগুলি গাড়োয়ান আসিয়া শব লইয়া শ্মশানে চলিয়া গেল। কেলো ও সুধা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিছনে পিছনে চলিল। গাড়োয়ানেরা শ্মশানে যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেল, গুরুচরণেরও খুবসম্ভব ওলাউঠা হইয়াছে। দেবিদাস খুব ব্যস্ত হইয়া একজন লোককে কুলবেড়িয়ায় বলিয়া পাঠাইলেন, কয়েকজন ছাত্র যেন শীঘ্রই এখানে আসে, ভীষণ রকমের ওলাউঠা দেখা দিয়াছে, রোগীদিগকে সর্ব্বক্ষণই সেবা না করিতে পারিলে বাঁচান কঠিন, এখনই যে কয়েকজন হউক আসিলে ভাল হয়। চিত্ত হরিমোহন বাবুর নিকটে গেল, বলিল এরূপ ওলাউঠা তাহারা কেহই পূর্ব্বে দেখে নাই, এখনই একটা উপায় করিতে হইবে—না করিলে গ্রাম আর রক্ষা পায় না। দেবিদাস ও রমেশ দুই জনেই গুরুচরণের কুটিরে গেল। তাহারা আসিতে গুরুচরণের মুখে একটু হাসি দেখা দিল।

গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিল—কেলোর বউ কেমন আছে? আপনারা সেখান হতে আসছেন বুঝি?

রমেশ বলিয়া ফেলিল—সে মারা গেছে।

গুরুচরণ কহিল—আহা মারা গেছে? কেলোর কপালে দুঃখ লিখেছে; বেচারা তাকে কত ভাল বাসত, তবুও সে তাকে কত না জ্বলিয়েছে; এখন সে নিজেই জ্বলবে। তাহার

পর দেবিদাসকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—বাবু, আমি বুড়ো ক্ষ্যাপা, আমি মলেই বাঁচি। আমাকে আপনারা ওষুধ দিতে এসেছেন? আপনারা হরিবোল দিয়ে আমাকে এখান হতে যাতে পাঠাতে পারেন তাই দেখুন। বলিয়া সে হাসিয়া হরিবোল দিতে লাগিল।

দেবিদাস ক্ষ্যাপার সে হাসি ও গানে খুব অভ্যস্ত ছিল। সে কহিল, "না, আগে ওষুধ খাও—তার পর হবে।" বলিয়া দেবিদাস গুরুচরণের বিছানা পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইল।

গুরুচরণ কহিল—রক্ষা কর ভগবান্, বাবা আমাকে সেবা করে কি নরকে পাঠাবে? ব্রাহ্মণ আপনারা, আপনাদের সেবা নিয়ে যে মহাপাতক হবে। বলিয়া সে বিছানা হইতে হাত জোড় করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল।

রামচরণ ও তাহার স্ত্রী নিকটে ছিল। তাহারা বিছানা পরিবর্ত্তন করিয়া দিল।

"আচ্ছা, আমাদের হাতে ঔষধ নেবে ত?" দেবিদাস জিজ্ঞাসা করিল।

গুরুচরণ কহিল—তা আপনাদের আম ডাক্তারী ওষুধ ও সব কিছু খাব না। আপনারা দুজনে একটু চরণামৃত দেন, তাই আমার ওষুধ হবে, আমি তা হলে নাম করতে করতে সুখে মরতে পারব।

রমেশ কহিল—এ এক আচ্ছা ক্ষ্যাপা দেখছি, ওঁ সব কথা আমরা শুনতে চাই না। তোমাকে ত বাঁচাতে হবে, ওষুধ না খেয়ে বাঁচবে কি করে?

গুরুচরণ কহিল—আমি ত মলেই বাঁচি, ব্রাহ্মণের চরণামৃত খেয়ে সুখে মরব তাই দিন আমাকে, আমি ওষুধ খেয়ে কি করব ?

দেবিদাস কহিল—"আচ্ছা, তাই তোমাকে দিচ্ছি; রামচরণ একটা ঝিনুক দাও ত", বলিয়া দেবিদাস রমেশকে বাহিরে ডাকিল।

বলিল, "ওকে এই হোমিওপ্যাথিক ওষুধটা দিলেই হবে, বলব এইটাই চরণামৃত।"

রমেশ তাহা শুনিয়া বেশ আমোদ পাইল। সে তাড়াতাড়ি নিজেই শিশি হইতে ঝিনুকে ঔষধ ঢালিয়া দিল।

গুরুচরণ গোবিন্দের স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া চরণামৃত পান করিল। পান করিয়া দেবিদাসকে বলিল—ছোট বাবু, আপনাকে একটি কথা বলব—মারা যাচ্ছি, মরবার আগে আপনাকে না বলে গেলে সুখে মরতে পারব না।

দেবিদাস কহিল—কি এমন কথা, এখনই বলবে ? গুরুচরণ কহিল—'হাঁ বলছি, তোমরা সর ত', বলিয়া রামচরণ ও তাহার স্ত্রীকে ঘর হইতে যাইতে সঙ্কেত করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, 'বাবু, আমাদের নায়েব মহাশয় ও দারোগা বাবুর, আপনিত জানেনই, ওঁদের স্বভাব ভাল নয়। কয় বৎসর হল তারা দুজনে এক কায়স্থের মেয়েকে জোর জবরদস্তি করে ঘর হতে বের করে এনেছে, তার স্বামীকে মেরে ফেলেছে, আর তার ছেলেকে কোথায় লুকিয়েছে। ছেলের

বয়স এখন আঠার উনিশ বৎসর হবে। মেয়েটি নায়েবের বাড়ীতেই আছে, আর বড় কান্না কাটি করছে। আহা তার দুঃখ শুনলে এমন কোন লোক নেই যার বুক ফেটে যায় না! আপনি যদি ছেলেটিকে উদ্ধার করে তাকে রক্ষা করতে পারেন, তা'হলে মায়ের আশীর্ব্বাদ পাবেন, ভগবান্‌ও আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবেন।'

দেবিদাস জিজ্ঞাসা করিল—তোমাকে কে বল্‌লে?

গুরুচরণ কহিল—মেয়েটি নিজেই আমাকে বলেছে; আমাকে যে দিন গারদ ঘরে খুব মারলে সে দিন সে এসে, আহা আমাকে কত সেবা কত যত্ন করলে—মা যেন ভগবতী হয়ে আলো করে কতক্ষণ ছিল, আর শুধু হাত বুলিয়ে দিয়ে আমাকে সারিয়ে দিলে। কিন্তু আমি তার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। ছেলেটিকে কত খুঁজলাম; কোথায়ও সন্ধান পেলাম না। শেষে সে দিন একজন বললে, একটী ফরসা ভদ্র ঘরের ছেলেকে একদিন এক বৈষ্ণবী ভিখারীর সঙ্গে ফুলবেড়িয়ার রাস্তায় দেখেছিল। আমি কত খোঁজ করলাম, পেলাম না। ছেলেটি খুব ফরসা হবে, বাবু, তার মায়ের রং মা ভগবতীর পায়ের রং এর মত যেন ফেটে পড়ছে।

দেবিদাস আবার জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে যে এত দিন বল নি?

গুরুচরণ কহিল—বাবু, নায়েব মশায় লোক কেমন, আপনি জানেন ত! একটু টের পেলে আমাকে জল জীবন্ত

গোর দেবে। আজ যদি মরে যাই একটা দুঃখ থেকে যাবে—তাই আপনাকে বল্লাম। আপনি যদি ছেলেটিকে উদ্ধার করেন—তা হলে আপনাকে আমি আর কি বলব, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন, দেখবেন। দেবিদাস কহিল—আমি যতদূর পার্ব্ব চেষ্টা করব। আমাদের জানা শুনা গ্রামের মধ্যে থাকলে আমি তাকে বের করতে পারব। গুরুচরণ কহিল—হরি করেন আপনি যেন খুঁজে পান।

ভিখারী দেবতা

সেই দিন রাত্রে দেবিদাস হরিমোহন বাবুর বাটীতে গেল। সুধাংশুবাবু ও বীরেন দুই জনেই টেবিলের উপর কাগজ পত্র রাখিয়া খুব কি লিখিতেছিল। দেবিদাস কহিল—বীরেন, এখনও তোমার শরীর সারে নাই, কি এত লিখছ? সুধাংশু বাবু কহিলেন—বীরেন এবার পাঁচ দিন খুব লিখেছে, তার প্রবন্ধ আমার কাগজেই রোজ বাহির হয়েছে। লোকে খুব প্রশংসা করছে, তোমাদের ত সময় নেই যে দেখবে, তোমরা রাত্রি দিনই খাটছ। বীরেন বেশ লিখতে পারে। দেবিদাস কহিল—আমি ত তার কিছুই জানতাম না। রমেশ কহিল—হাঁ, বীরেন বেশ লেখে, কল্‌কাতায় মাঝে

মাঝে সে প্রবন্ধ লিখত, তাতে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। আর দেশ ও সমাজ ছাড়া সে আর কোন বিষয় সম্বন্ধে লেখে না। গানও খুব ভাল লিখতে পারে—অনেক গান আমাদের মুখস্থ আছে—এখন কি লিখ্‌ছ হে? বীরেন এতক্ষণ আনত মুখে ছিল, এখন বলিল—এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে। রমেশ কহিল—বেশ ভালই করেছ। দেবিদাস কহিল—কোথায় লেখা গুলো দেখি। দেবিদাস তাহার প্রবন্ধ হইতে মাঝে মাঝে পড়িতে লাগিল ও আর সকলে শুনিতে লাগিল। এমন সময়ে হরিমোহন বাবু ও চিত্ত বাটী ঢুকিলেন। দেবিদাস জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এখন কোথায় গিয়েছিলেন? হরিমোহন বাবু কহিলেন—আমি একবার বৈকাল বেলায় দক্ষিণ পাড়ায় গিয়াছিলাম। তুমি চিত্তকে দিয়ে বলে পাঠালে বড় খারাপ রকমের ওলাউঠা হ'চ্ছে, তাই দেখতে গিয়াছিলাম। আমার বোধ হ'চ্ছে দক্ষিণ পাড়ার গৌরাঙ্গ পুকুরের জলের জন্যই ওলাউঠা এত খারাপ হয়েছে ও ছড়িয়ে পড়ছে। দেখে এলাম ময়লা কাপড় সব ঐ পুকুরের পাড়ে পাড়ে রয়েছে, আর গৌরাঙ্গ পুকুর ছাড়া ত আর জলের উপায় নাই। এতে রোগ হবে না কেন? এক কাছারী বাড়ীর পুকুর আছে, তা শুনলাম নায়েব নাকি সেখানকার জল নিতে বারণ করেছে। তার পর বৈকালে ফিরে আসবার সময়ে শুনলাম, শ্মশান হতে ফিরবার সময়ে কেলোরও ওলাউঠা হয়েছে, তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে। আমি তার বাড়ী হ'তে

আসছি, তার অবস্থা বড় খারাপ। চিত্তর কাছে ঔষধ ছিল, আমি কয়েকটা ওষুধই চেষ্টা করলাম, কিছু হল না।

দেবিদাস ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল, কহিল—আবার কেলোরও হয়েছে? আমি যাই তা হলে, এখনি যাই। বলিয়া অগ্রসর হইল।

রমেশ কহিল—দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি, এত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? তাহারা দুইজনে চলিল। কেলোর বাড়ী পৌঁছিতে তাহাদের বিলম্ব হইল না।

তাহারা পৌঁছিয়া দেখিল কেলো অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে; সিধু একটা কাপড়ের পুঁটুলি গরম করিয়া তাহার হাত পায়ে সেক দিতেছে। সুধা কেলোর মাথার শিয়রে হাত রাখিয়া কাঁদিতেছে। কেলোর পরিচিত কয়েকটি লোক ঘরে বসিয়া পরস্পরের মুখ দেখিয়া একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কা জানাইতেছে।

দেবিদাস ডাকিল—কেলো! কেলো কোন উত্তর দিল না। আবার ডাকিল—কেলো, ও কেলো! কেলো তখন ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—কে?

দেবিদাস কহিল—কেলো আমাকে চিনতে পারছিস্ না?

মুমূর্ষু কি জানি কেন একটা নূতন বল পাইল, সে একটু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—এই যে ছোট বাবু এসেছ, যাক্ আমি এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম।

দেবিদাস বিচলিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কেন কি হয়েছে?

কেলো কহিল—আমি আর ত বেশীক্ষণ বাঁচবনা, তাই—সুধা তাহার মাথার শিহরে খুব কাঁদিয়া উঠিল।

সিধু কহিল—চুপ কর, কাঁদিস নি—কড়ার আগুনটা নিবে যাচ্ছে, ঘুঁটে দে, পুটুলিটা গরম কর্।

সুধা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—তুই কর, আমি পারব না। বাবাগো, আমাকে একলা ফেলে যেয়ো না। বলিয়া পিতার ডান হাতের উপর সে কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ নীচু করিয়া পড়িল।

কেলো ক্ষীণ কণ্ঠে, থামিয়া থামিয়া, কহিতে লাগিল—সুধা, মা, আয় বাছা আয়। তোকে আশীর্ব্বাদ করি—মা তোর বিয়ে দিয়ে যেতে পার্লাম না এই দুঃখ রহিল—তোর মা আগে গিয়েছে, আমি তার পিছনে সেখানে চললাম—মা, তোকে কত কষ্ট দিয়েছি—আমি যথাসাধ্য করেছি তবুও তোদেরকে কষ্ট দিয়েছি—আর শেষকালে তোকে এ ভিটাটাও দিয়ে যেতে পারলাম না—হাঁ ছোট বাবু, ছোট বাবু, চলে গেছেন? না, এই যে; আপনাকে বলছিলাম, নায়েবের কাছ হতে যে তিনশত টাকা নিয়েছিলাম তার, এই আকালের আগে, পঞ্চাশ টাকা শুধেছি—অনেক কষ্টে, না খেয়ে আর এদেরকে না খেতে দিয়ে। তা আমার ত আর কিছুই নাই, এই চালাটা, আর বিঘে দুই জমি, তাই নায়েব মিলাম করে সব নিক্, আপনি তাই দেখবেন আর আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সিধুর সঙ্গে সুধার বিয়েটা শীগ্গির দিয়ে

যেবেন। সিধু ত সেয়ানা হয়েছে, সে নিজের আর সুধার পেট চালাতে পারবে। সিধু, আয় তোকে আশীর্ব্বাদ করি—

সিধু অবিচলিত স্বরে কহিল—বাবা, অমন করছ কেন? এখনই ত ভাল হবে।

কেলো তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—হ্যাঁ, একবারে ভাল হব। সিধু বাবা, তোকেও কিছু দিয়ে যেতে পারলাম না, সুধাকে যত্ন করিস্—বেশ বুদ্ধি করে সংসার চালাস্।

তাহার পর দেবিদাসের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার সিধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আহা ছোট বাবুর দয়া পেয়েছিস্—খুব ভাগ্য জানবি—ভগবানের দয়া জানিস্—হ্যাঁ, তাঁর একটু চরণ-ধোয়া জল দেত। তুই নিজে নিয়ে খাইয়ে দে—

দেবিদাস সিধুকে একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধে জল ঢালিয়া দিল।

সিধু জিজ্ঞাসা করিল—এ কি? কহিয়া সেই অসময়েও একটু হাসিল।

দেবিদাস কহিল—ঐ দে এখন।

সিধু উহা পান করাইয়া দিল। সুধা পিতার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। কেলো শ্রান্ত হইয়া চুপ করিল শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

সে ঘুম আর ভাঙ্গিল না। সুধাকে কাঁদাইয়া, সিধুকে কাঁদাইয়া, তাহার স্বজাতি কুটুম্বদিগকে কাঁদাইয়া, দেবিদাসকে

কাঁদাইয়া, কেলো তাহার স্ত্রীকে খুঁজিতে এই অন্ধকার পথে ভরাবিশ্বাসে চলিয়া গেল।

সাবধান

পরদিন প্রত্যুষে দেবিদাস ও রমেশ দুইজনে পরামর্শ করিয়া নায়েবের নিকট গেল। গ্রামবাসিগণ যাহাতে কাছারী বাড়ীর পুকুর ব্যবহার করিতে পারে, সে জন্য তাহার নিকট অনুমতি লওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য।

অনেকক্ষণ তাহারা কাছারী বাড়ীতে গিয়া বসিয়া রহিল। শেষে আটটার সময়ে নায়েব বাবু শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিলেন। তাঁহার পদদ্বয় একটু চঞ্চল ও চক্ষুদ্বয় রক্তাভ ছিল। তিনি জড়িত স্বরে কহিলেন—মশায়দের এত সকাল সকাল আগমন, কি খবর?

দেবিদাস কহিল—আমরা এসেছি—একটা বিশেষ দরকার। সব পাড়াতেই ওলাউঠা খুব হ'চ্ছে, গ্রামের পুকুরের মধ্যে এক গৌরাঙ্গ পুকুর, আর এই কাছারীবাড়ীর পুকুর—গৌরাঙ্গ পুকুরের জল একবারে খারাপ হয়ে গেছে। আপনি বল্লে লোকে কাছারীবাড়ীর পুকুরের জল খেতে পারে, তা না হলে ওলাউঠা থামবে না।

নায়েব কহিল—তা ওলাওঠা হচ্ছে বটে, সে ওপাড়ায়;

ওপাড়ার লোকে এ পুকুরের জল নিতে আসলে এ পাড়ার লোকেও যে ওলাউঠায় মরবে—আমি কি করব বাবু, তোমাদের কথা শুনে কি খাল কেটে ঘরে কুমীর আনব? সে করতে পারব না।

দেবিদাস কহিল—আপনি পাইক রেখে দেবেন; পাইকরা দেখবে যাতে লোকে এসে শুধু খাবার জল নিয়ে যায়—কেহই যেন পুকুরে স্নান করতে বা কাপড় কাচতে না পায়।

নায়েব কহিল—ক'জনই বা পাইক আছে, যে এক জন পুকুর ধারে ঠায়ে বসে থাকবে?

দেবিদাস কহিল—পুকুর আগলাবার আর ভাবনা কি? আপনাদের ত অনেক লোক আছে, আপনি যদি বলেন আমরাও না হয় লোক দিতে পারি।

নায়েব কহিল—সে হবে না বাবু, কেন মিথ্যা বকৃছ—এত কাল হ'ল কাছারীবাড়ীর পুকুর জমিদার বা জমিদারী সংক্রান্ত লোক ভিন্ন অন্য কেহ ব্যবহার করে নি, আর তোমার কথায় আমি ছেড়ে দেব—কি বল হে পাগলের মত!

দেবিদাস কহিল—অনুগ্রহ করে দেন, তা না দিলে ওলাউঠায় গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে।

নায়েব কহিল—তা তোমাদের কি হে? ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে যত ছত্রিশ জাতের ময়লা পরিষ্কার করা কাজ হয়েছে—ব্রাহ্মণের ছেলের মেথরের কাজ করা কেন? আপনার চরকায় তেল দাও গে।

রমেশ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। নায়েবের উচ্চকণ্ঠ ও বিদ্রূপের কথা শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না। সে কহিল—আমরা যা করি তা বেশ করি, আপনার শাসাবার দরকার কি? যাদেরকে শাসাতে পারেন, তাদেরকে শাসান গিয়ে। আমাদের কাছে ওসব জারি জুরী খাটবে না, বলে দিলাম।

দেবিদাস এতক্ষণ রমেশের বাম হাতের একটা আঙুল খুব জোরে ধরিয়াছিল পাছে সে কোন কড়া কথা শুনাইয়া দেয়, কিন্তু রমেশ নিষেধ মানিল না। নায়েব মহাশয়কে কেহ কখনও এরূপ ভাবে স্পষ্ট কথা মুখের উপর বলে নাই। তিনি রমেশের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তিনি রাগিলেন, কিন্তু মদের নেশা রাগকে তাঁহার মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে অবসর দিল না।

দেবিদাস কহিল—যাক্ ওসব কথা; পুকুরটা তা হলে পাওয়া যাবে না?

নায়েব কহিল—না গো না, কানে শুনতে পেয়েছ?

দেবিদাস ও রমেশ চলিয়া গেল। রমেশ যাইবার পূর্ব্বে নায়েবের চোখের উপর একটা ঘৃণাপরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইলে নায়েব বংশীকে ডাকিলেন, বংশী নিকটে আসিলে তিনি কহিলেন—ঐ ছেলেটা বুঝি কলকাতা হতে এসেছে, নয় রে? আমার মুখের উপর কথা বলে

গেল, বেটার বুকের পাটা দেখলি! দাঁড়া তোমায় একবার মজা দেখাব! বেটার আবার চোখরাঙ্গানি!

দেবিদাস ও রমেশ ফিরিয়া গিয়া সকলেরই নিকট তাহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা বিবৃত করিল। রমেশ ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইল, বীরেন ক্রোধে কথা কহিল না, চিত্ত কহিল—দু চার ঘা দিয়ে এলেই ত হত। দেবিদাস কহিল—রাগ করে কোন ফল নেই। ঐ পুকুর পেতেই হবে, না পাওয়া গেলে গ্রাম একবারে শ্মশান হয়ে যাবে। হরিমোহন বাবু কহিলেন—আমি একবার বলে দেখি। তোমরা ঝগড়া করে এসেছ, আমি বুঝিয়ে বললেই শুনবে। রমেশ, বীরেন ও চিত্ত তিন জনই হরিমোহন বাবুকে নিষেধ করিল। তিনি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া একাই কাছারী বাড়ীর দিকে গেলেন। নায়েব মহাশয় তাঁহার কথা রাখিলেন না। তাঁহাকে দুই একটা কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। হরিমোহন বাবু বাড়ী ফিরিয়া শুধু বলিলেন যে নায়েব রাজী হল না। তাঁহাকে যে সে অপমান করিয়াছে এ কথা ছাত্রেরা জানিতে পারিল না। কিন্তু তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া উহারা সকলেই অনুমান করিয়া লইল।

রমেশ ইতিমধ্যেই একটা মতলব আঁটিয়াছে। সে বিশ্বম্ভরকে টেলিগ্রাম করিয়া অনুমতি আনাইতে চাহিল। সকলেই রাজী হইল। টেলিগ্রাম চলিয়া গেল। বীরেন তাহা জানিত না। সে যখনি শুনিল হরিমোহন বাবুকেও নায়েব

প্রত্যাখান করিয়াছে, তখন চিত্তকে ডাকিয়া লাইব্রেরী ঘরে গেল। সেখানে বসিয়া সে নায়েবকে এই মর্ম্মে একটা চিঠি দিল যে, 'তুমি যদি গ্রামবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার কর, তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।'

বিশ্বম্ভর নায়েবকে কাছারীবাড়ীর পুকুর সাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে টেলিগ্রাম করিল। রমেশও একটা টেলিগ্রাম পাইল। রমেশ নায়েবের নিকট যাইয়া তাহাকে একবার শাসাইয়া আসিল—'কেমন বড় জেদ ধরেছিলে যে, শেষ কালে ত দিতে হল!' নায়েব অপমানটা সহ্য করিল। কারণ তাহার এক্ষণে বেশ একটু ভয় হইয়াছিল। চাকুরী যাবে এই ভয় নহে, কারণ সে জানিত সে নায়েবী না করিলে বিশ্বম্ভর মাস মাস কলিকাতায় বসিয়া তাহার জমিদারী হইতে কখনই নিয়ম মত টাকা পাইবে না। জমিদারীতে একটি পয়সাও আদায় পত্র হইত না। সে নায়েব হইয়া কড়া ক্রান্তি হিসাবে খাজানা আদায় করিতেছে। তাহা ছাড়া জমিদারীতে সে শান্তি আনিয়াছে। পূর্ব্বে মোকদ্দমার পর মোকদ্দমা হইত, জমিদারের খুব অর্থ ব্যয় হইত, এখন মোকদ্দমা একবারেই হয় না; তাহার কৌশলে বিদ্রোহী প্রজারা আর মাথা তুলিতে পারে নাই। তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া, সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, তাহাদের নামে বাকী খাজনার নালিশ চালাইয়া, তাহাদিগকে কাছারীবাড়ী আনিয়া উৎপীড়ন করিয়া, সে তাহাদিগকে জমিদারের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে। নায়েবের

কৌশল ও প্রবল প্রতাপের নিকট কেহই সাহস করিয়া প্রজাদিগের অভাব অভিযোগ, এমন কি স্বত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে পারিত না। বিশ্বম্ভর বুঝিয়াছে, নায়েবের গুণে জমিদারীর আয় বেশ বাড়িয়াছে, লোকসান মহাল হইতে লাভ হইতেছে, সুতরাং সে নায়েবকে বেশ সুনজরেই দেখে। বিশ্বম্ভর হইতে নায়েবের কোন ভয় নাই। নায়েবের ভয় হইয়াছে, এক্ষণে কলিকাতা হইতে আগত ছাত্রদিগের মধ্যে এক জন যে চিঠি লিখিয়াছে তাহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত, সেই চিঠিতে। কাজেই নায়েব বিনা আপত্তিতে পুকুর ছাড়িয়া দিল। রমেশ যে তাহাকে অপমান করিয়া গেল তাহা সে নীরবে সহ্য করিল। যে চিঠি খানি হইতে তাহার আসল ভয় তাহা আরও দুই চারিবার পড়িয়া সে দারোগার হাতে দিল। দারোগা তাহাকে বুঝাইয়া দিল—তোমার কোন ভয় নাই; আমি এই পত্রলেখককে ধরিয়া রীতিমত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করিতেছি। তবুও নায়েবের ভয় গেল না।

জীবন সঞ্চার

ওলাউঠা শেষে থামিল। কিন্তু থামিবার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র গ্রামের ছয় আনা রকম লোককে গ্রাস করিয়া গেল। আমাদের পরিচিতের মধ্যে কেলো ও তাহার স্ত্রীকে গ্রাস করিল, রাম-

চরণকেও গ্রাস করিল। অনেকে রোগাক্রান্ত হইয়াও রক্ষা পাইল। আমাদের পরিচিত গুরুচরণ তাহাদের মধ্যে একজন। এক বৎসর অজন্মা গেল, তাহার পরের বৎসর অনাবৃষ্টি ও অজন্মা, তাহার পরের বৎসর অনাবৃষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ও ওলা-উঠা। তিনটি দুর্ব্বৎসর শেষে কালস্রোতে মিশিয়া গেল। ঘরে ঘরে ক্ষুধিতের করুণক্রন্দন, পীড়িতের আর্ত্তনাদ, পিপাসাতুরের অস্ফুট বেদনা, শেষে কালপ্রবাহে কত লোকের চক্ষের জলের সহিত মিশিয়া গেল। যে আকাশ অগ্নিকণা ফুটাইতেছিল, সেই আকাশেরই এক কোণে নবনীরদমালার উদয় হইল। পিপাসাতুর পৃথিবী চাতক পাখীর মত আকাশকোণে চাহিয়া থাকিল। সে চাহনিতে কত ব্যাকুলতা, কত আশা ছিল। আশা মিটিল—পৃথিবীর বিশুষ্ক কণ্ঠে নববর্ষা পিপাসার বারি ঢালিয়া দিল। রৌদ্র-রোগ-তাপ-দগ্ধ পৃথিবীর বুক শীতল হইল। দেবতার শান্তিজলবর্ষণে রোগ-দাহের অবসান হইল। কৃষকের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইল। কৃষকপত্নী শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া তাহাকে আকাশের মেঘ দেখাইতে লাগিল। শিশু মেঘ ও বৃষ্টিধারা দেখিয়া হাসিল, সকলেরই প্রাণে সাহস আসিল,আশার সঞ্চার হইল। অনাবৃষ্টির পর সুবৃষ্টি হইল, কিন্তু কৃষকগণ তবুও আবাদ করিতে পারে না। জমি ভিজিয়াছে, কিন্তু কৃষকের লাঙ্গল নাই, বলদ নাই, বীজ ধান নাই। কাহারও ঘরে অর্থ নাই, যে অর্থ দিয়া উহা ক্রয় করে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন; কিন্তু পুরুষকার অসহায়।

দেবিদাস ও তাহার সঙ্গিগণ গ্রামবাসীদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে ঋণ দিল। দূরদেশ হইতে বীজধান ক্রয় করিয়া আনিয়া দিল। গ্রামের মণ্ডলগণ অর্থ লইয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল, সকলে পরস্পরের ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং সকলেই এই স্বত্ব করিল যে তাহাদের উৎপন্ন শস্য কখনই ব্যয়সায়ীদিগকে বিক্রয় করিয়া গ্রাম হইতে শস্য রপ্তানি করিতে দিবে না।

কৃষকের পুরুষকার এক্ষণে সার্থক হইল। কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। কৃষক, তাহার স্ত্রী ও পুত্রের অন্নবস্ত্রাভাব মোচন করিতে পারিবে বলিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইল। কৃষকপত্নী আশার প্ররোচনায় পোষাকী কাপড় ও দুই একখানা গহনার জন্যও আবদার করিতে লাগিল।

দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে যে সকল ছাত্র রোগচর্য্যা ও অন্নবিতরণ কার্য্যে এত দিন খুব ব্যস্ত ছিল, তাহাদের কাজ আর রহিল না। দেবিদাস ও রমেশ সে সকল গ্রামে যাইয়া—গ্রামবাসিগণের মধ্যে রোগ অথবা দুর্ভিক্ষের অনাহারের পর এক্ষণে যাহারা সবল হইতে পারিয়াছে—তাহাদিগকে লাঙ্গল, বলদ ও বীজধান ক্রয় করিবার জন্য অর্থ দিল। দুই একটা গ্রামে গ্রামবাসিগণের যতগুলি লাঙ্গল ও বলদ প্রয়োজন হইল, তাহা এক সঙ্গে বিদেশ হইতে সুবিধা দরে ক্রয় করিয়া আনিয়া দিল। এক এক গ্রামের কৃষকগণ সমবেত হইয়া ঐ অর্থ তাহাদের ঋণরূপে স্বীকার করিল। একজন ঋণ শোধ করিতে না পারিলে

সকলে মিলিয়া ঐ ঋণ শোধ করিবে এবং কেহই ভিন্ন গ্রামের ব্যবসায়ীদিগকে শস্য বিক্রয় করিতে পারিবে না, এই সর্ত্তে দেবিদাস তাহাদিগকে অর্থ দিল।

ছাত্রগণের মধ্যে সকলেই—তাহাদের কাজ শেষ হইল দেখিয়া চলিয়া গেল। শুধু গেল না যাহারা প্রথমে আসিয়াছিল—বীরেন, চিত্তরঞ্জন ও রমেশ। তাহারা ভাবিল তাহাদের অনেক কাজ এখনও বাকী আছে। এই কয় মাস তাহারা গ্রামবাসীদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছে; এক্ষণে তাহাদিগের কাজ হইল, লোকদিগের মধ্যে জীবনী শক্তির সঞ্চার করা। দেবিদাস ও রমেশ কৃষকগণকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল। তাহারা শীঘ্রই ঐ সকল গ্রামের কৃষিকার্য্যের একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিল। বীরেন ও চিত্ত কৃষক বালকবালিকাদিগকে লইয়া শিক্ষা দিতে লাগিল। বীরেন কথক সাজিল। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, ভাগবত, বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিজ্ঞান লইয়া সে গল্প করিয়া কৃষক বালকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিল। কৃষক বালকেরা তাহার কথা ও গল্প শুনিয়া খুব আনন্দিত হইল। চিত্তরঞ্জন হরিমোহন বাবুর বাটী হইতে নানা প্রকারের ছবির বই ও চার্ট লইয়া গিয়া কৃষক বালকদিগকে ছবি দেখাইতে লাগিল, ও গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে লাগিল। তাহাদের পাঠশালার অধিবেশন রাত্রে হইত। অনেক কৃষক তাহাদের পুত্রগণের নিকট পাঠশালায় কথকতা হয় শুনিয়া,

সমস্ত দিন মাঠে পরিশ্রমের পর, সন্ধ্যার সময়ে একটু বিশ্রাম করিয়াই পাঠশালায় আসিত। এতদ্ব্যতীত দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে যে সকল অনাথ বালক প্রতিপালিত হইতেছিল, তাহাদের অবিভাবক ছাত্রগণ এক্ষণে চলিয়া যাওয়াতে তাহারা এই গ্রামেই আসিয়াছিল। তাহারাও পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল।

দেবিদাস ও রমেশ সমস্তদিন ঋণদান, লাঙ্গল, বলদ ও বীজ ধান ক্রয়ের সাহায্য দান ও মাঠে মাঠে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিত। রাত্রে তাহারা বিশ্রাম করিত। বীরেন ও চিত্ত সন্ধ্যা হইতেই শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। চিত্ত সমস্ত দিনই হরিমোহন বাবুর নিকট পড়াশুনা করিত। বীরেন ইংরাজী বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখিত। তাহার প্রবন্ধ সমূহে দেশের দারিদ্র্য মোচন করিবার জন্য কোন্ কোন্ কর্ম্মপ্রণালী আবশ্যক, পল্লীগ্রামের অভাব অভিযোগ, পল্লীবাসীর সহিত জমিদার, নায়েব ও পুলিসের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা থাকিত। ইতিমধ্যেই তাহারা বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মাসিক ও সপ্তাহিক পত্রের ভিতর দিয়া ও পুস্তকাকারে বহুল প্রচারিত হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের পলিটিকাল ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব, এমন কি গ্রামের দারোগা মহাশয়ের নিকটও পৌঁছিয়াছে। সম্পাদক সুধাংশু বাবু প্রবন্ধগুলি ছাপিবার পূর্ব্বে একবার দেখিয়া দিতেন বলিয়া বীরেন এখনও আইন

লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, অথবা আইন তাহাকে লঙ্ঘন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই।

প্রবৃত্তির ইন্ধন

গ্রামে সুকাজ হইতেছে, কুকাজও হইতেছে। এরূপ একটা ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও ওলাউঠা গ্রামকে বিধ্বস্ত করিয়া গেল, তবুও নায়েব ও দারোগা মহাশয়দের প্রমোদগৃহে আমোদ প্রমোদের কোন ব্যতিক্রম হইল না। তাহা নিশ্চিন্তভাবেই চলিতেছিল। সংসারের নিয়মই এই পাশাপাশি সবই সমানভাবে চলিতেছে,—দারিদ্র্যের হাহাকার, বিলাসিতার প্রমোদ, মহত্ত্বের মহিমা, হীনতার জঘন্যতা, ত্যাগ, ভোগ, পবিত্রতা, অপবিত্রতা, পাপ, পুণ্য সবই একই সময়ে একই সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে,—তাহা না দাঁড়াইলে বোধ হয় জগতের স্থিতি উন্নতি অসম্ভব। তাই দুর্ভিক্ষের হাহাকারের সময়েও নায়েবের প্রমোদ গৃহে সুরাপান ও নৃত্যগীতের বিরাম ছিল না। দ্বিতলের সুসজ্জিত ঘর, ঘরের দেওয়ালে নগ্ন স্ত্রী মূর্ত্তির ছবি ও আয়না রক্ষিত হইয়াছে। একপাশে একটা টেবিল তাহাতে কয়েক বোতল মদ। ঘরে এক ফরাস বিছানা রহিয়াছে। দেওয়ালের এক কোণে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। দুর্ভিক্ষ ও মারী যখন পৃথিবীকে এক বিষাদ ও দুঃখের আবরণের গাঢ় অন্ধকারে

ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তখনও সেই গৃহে আমোদ আলোক উজ্জ্বল ছিল। প্রত্যহই সেখানে বন্ধুসমাগম হইত। বারবিলাসিনীগণ প্রত্যহই মনোহর বেশভূষায় সজ্জিতা হইত। প্রত্যহই সেখানে বাদ্যযন্ত্রের সহিত নৃত্য গীত হইত। হাসি ও সুরার ফোয়ারা এক সঙ্গে ছুটিত, সকলেই আমোদ প্রমোদে মাতোয়ারা হইত। প্রত্যহই আমোদ প্রমোদ শেষে অবসাদে পরিণত হইত। অবসন্ন দেহে টলিতে টলিতে সকলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিত। বিলাসীদের মনোহর বেশভূষা আলুথালু হইত। বিলাসীদের গীত বেসুরা হইত, কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিত, তাহাদের চঞ্চল চরণ স্খলিত হইত, প্রতি অঙ্গে লাস্যের পরিবর্তে আলস্য আসিত। নেশা প্রমোদ উত্তেজনায় অভিভূত হইয়া শেষে শয্যায় সকলে গড়াইয়া পড়িত। শয্যায় আবার মদ্যপান। মদের স্রোত বহিত, শয্যা ভিজিয়া যাইত। যতক্ষণ নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহাদিগকে একবারে অচেতন না করিত ততক্ষণ অবসন্ন দেহ ও মন উহাদের আসন্ন বিশ্রামকে লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করিত। প্রত্যহই নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ, নেশা উত্তেজনা, আবার প্রত্যহই অবসাদ। প্রত্যহই প্রভাত সমীরণ আসিয়া ঐ ঘরের উষ্ণ বাতাস দূর করিয়া দিত, তাহাদের উষ্ণ দেহ শীতল করিত। তবুও তাহাদের দেহের উষ্ণতা যাইত না, মনের উত্তেজনা যাইত না। উত্তেজনা অবসাদ, অবসাদ উত্তেজনা, এরূপ প্রত্যহ চলিতে লাগিল। প্রমোদ গৃহের বাহিরে, সংসারের চারিদিকে

শ্মশান, কিন্তু প্রমোদ গৃহে আমোদ। বাহিরে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য, নরনারীর বিভীষিকা, ভিতরে বিলাসপূর্ণ লাস্যনৃত্যে নরনারীর প্রমোদ লীলা। বাহিরে পুরুষ দেবতা, বাহিরে আদি পুরুষের রুদ্রমূর্ত্তি, ভিতরে দেবতা স্ত্রী, ভিতরে আদ্যা স্ত্রীর মোহিনী মূর্ত্তি। প্রকৃতি পুরুষের এইরূপ মধুর ভীষণ অভিনয় চলিতেছে।

প্রমোদলীলার আয়োজন হইতেছে। রাত্রি দশটার সময়ে প্রমোদগৃহে দারোগা ও নায়েবের একটা পরামর্শ চলিতেছে। নায়েব কহিল—আর একটার ত যোগাড় করে এসেছি। খুব সুন্দরী; কেলো মরে গেছে, তার মেয়ে।" আমি কেলোর কাছে তিনশ' টাকা পাই; বলে এলাম কিছু দিতে হবে না, শুধু তোমাকে চাই। সে বুঝতে পারলে না, কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল—একবারে কচি কিনা—তারপর ঘাড় নাড়লে। কেমন চাল চেলেছি, টাকাটা এতদিন আদায় করিনি এই কাজটা হাসিল করব বলে।

"বাড়ীতে আর কে আছে?" "কেউ নেই শুধু সেই—পাড়াটায় কিন্তু লোকজন থাকে, না চেঁচায়।" "তাতে ভয় কি? নিজে একটা পাল্কী নিয়ে গেলেই হবে।" "আচ্ছা, শীঘ্র করে ফেলা যাক, এখন নেহাৎ একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, অরুচি ধরেছে—একটা নূতন এলে বেড়ে হবে"—বলিয়া তাহারা বোতল বোতল মদ খাইতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল—"বাঃ বাঃ বেড়ে হবে"—

একজন অভাগা রমণী আসিয়া কহিল—কিসের কথা হচ্ছে তোমাদের, আবার কে আসবে ? আমাদের নিয়ে বুঝি আর হয় না ?

"চোপরাও, হারামজাদি—আমাদের কথায় কথা !"

রমণী হাসিয়া কহিল—"মেজাজ খুব কড়া যে !"

"ফের কথা !"

রমণী তাহাদের নিষেধ না শুনিয়া তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। "তবেরে হারামজাদি", সঙ্গে সঙ্গে এক পদাঘাতে রমণী দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। রমণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ঘরের অন্য সকলে হাসিয়া উঠিল।

যে কাঁদিল, যাহারা হাসিল, তাহাদের সকলেরই হৃদয়ে শ্মশানের চিতা জ্বলিতেছিল। যে কাঁদিল তাহার চক্ষে জল, যাহারা হাসিল তাহাদের মুখে হাসি, এই প্রভেদ। প্রমোদ গৃহের ভিতরেও শ্মশান, বাহিরেও শ্মশান।

শ্মশানে চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, প্রত্যেক হৃদয় আপনার বৃত্তি গুলিকে ইন্ধন করিয়া, আপনারই উপর চিতা জ্বালাইয়াছে; কে জানে কবে হৃদয়ে অমৃত-মন্দাকিনী বহিয়া এ চিতাকে চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত করিবে !

সহায়

বৈকালবেলা। দেবিদাস তাহাদের বাটীতে নাই, হরিমোহন বাবুর বাটীতে গিয়াছে। হৈমী বাটীর ভিতর পা ধুইতেছে, সিধু বাড়ীর সম্মুখের বাগানের কয়েকটা বেল ও জুঁই গাছে জল দিতেছে। এমন সময় সুধা বাটী ঢুকিল। সিধু জল দিতে দিতে থামিল। সুধা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—দাদা বাবু বাড়ীতে নেই? সিধু ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না। সুধা অসঙ্কোচে সিধুর নিকট গেল। দুই জনে সিধুর ঘরের সম্মুখে বাগানের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

সিধু জিজ্ঞাসা করিল—তুই আসিস্ নি যে, আজ কতদিন পরে এলি—কেন বল্ ত?

সুধা কহিল—বড় লজ্জা করে—দাদা বাবু কি ভাববে?

সিধু কহিল—কি আবার ভাববে? দাদা বাবু ত সব জানে। সুধা কহিল—কি জানে? সিধু কহিল—তুই যেন জানিস্ নি—আমাদের বিয়ে আবার কি? সুধা মুখ নত করিয়া, তাহার অঞ্চলের পাড়টা দেখিতে লাগিল। সিধু তাহার দিকে চাহিয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে সুধা মৃদুকণ্ঠে কহিল—তুই আমাদের বাড়ী কবে গিয়ে থাকবি? সিধু কহিল—আমি কাপড়ের দোকান হতে, বিশ টাকা পেয়েছি, এই মাস গেলে দাদা বাবু আর কিছু টাকা দোকান

হতে দেবে। তখন বিয়ে হবে, দাদা বাবু বলেছে। সুধা কহিল—না, আমার বুঝি ভয় করে না? একা রাতে থাকতে এমনি ভয় হয়। নিজে ঘরে বেশ ঘুমাও, আর আমি ভয়ে ভয়ে রাত কাটাই। সিধু কহিল—ভয় আবার কিসের—একা থাকলে কি ভয়? সুধা কহিল—ভূতের, চোরের, ভয় হয় না? একবার একলা থেকে দেখনা কেমন হয়! সিধু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—না ভয় নেই। সুধা কহিল—অ্যাঁ, আবার ভয় নেই, বলছিস্!

সুধার চক্ষে জল দেখা দিল। সে এমন একটা ভয় অভিমান ও তিরস্কার পূর্ণ সজল চক্ষু সিধুর দৃষ্টি পথে ধরিল যে সিধুও কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া থাকিল। তাহার পর সিধু কহিল—কাঁদছিস্ কেন, কাঁদিস্ নি। বলিয়া তাহার চক্ষের জল, আপনার হাত দিয়া মুছাইয়া দিল। কিছুক্ষণ তাহাদের ভাষা ছিল না। তাহাদের দুই জনেরই হৃৎপিণ্ডটা দ্রুতস্পন্দনে পরস্পরের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিতেছিল। শেষে সুধা কহিল—আমি যাই এখন।

সিধু কহিল—দাঁড়ানা, দাদাবাবু এখন আসবে না। সুধা জিজ্ঞাসা করিল—দাদা বাবু কোথায় গেছে? সিধু কহিল—হরিমোহন বাবুর বাটীতে, কেন কি চাই তোর? সুধা কহিল—আমি বলতে এসেছিলাম, নায়েব বাবু বলে গেল বাবার কাছে তিনশ টাকা পেত, সে টাকা নেবে না। সিধু জিজ্ঞাসা করলে—টাকা নেবে না বললে! সুধা কহিল—হাঁ

নেবে না। সিধু জিজ্ঞাসা করিল—আর কি বল্‌লে? সুধা কহিল—আর আমাকে তার কাছে যেতে বল্‌লে। সিধু জিজ্ঞাসা করিল—তোকে যেতে বল্‌লে কেন? সুধা কহিল—কেন তা বলে নি। শুধু বল্লে, আমি তোকে চাই তা হলে টাকা লাগবে না, আমি যাব বল্লাম। সুধা বাটীর ভিতর হৈমীর সহিত দেখা করিতে গেল। কিছুক্ষণ থাকিয়া সে চলিয়া গেল।

সিধু জানিত নায়েব মহাশয় কখনও কাহাকে দয়া করিয়া টাকাটি ছাড়িয়া দেন না। এক্ষেত্রে তিনি কেন যে তিনশ টাকা দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন ইহা সে বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ সে ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে নায়েবের সেই স্থূল দেহ, গোল মুখ, তাহার দুই একটা অত্যাচারের ঘটনা উহার মনে পড়িতেছিল, তখন তাঁহার প্রবল প্রতাপ সে ধারণা করিতেছিল। তাহার পর, তাহার মনে পড়িল তাহার দুশ্চরিত্রের জন্য তাহার প্রতি সকল লোকের ঘৃণা। তখন সুধাকে জড়াইয়া একটা আতঙ্ক তাহার মনকে অধিকার করিল। সে ভাবিতে লাগিল সে কি এই প্রকার প্রতাপশালী নায়েবের নিকট একবারেই অসহায়, সুধার জন্য তাহার সব পণ করিলেও সে কি প্রতিকার করিতে পারিবে না? দাদা বাবু তাহাকে ত সাহায্য করিবেনই, কিন্তু দাদা বাবুকেই বা নির্লজ্জ হইয়া কি করিয়া সব বলা যায়? আবার সুধার ভয়ের কথা তাহার মনে হইল, এতদিন বিবাহ হইয়া গেলে এত ভয়ের

কারণ থাকিত না। সিধু স্থির করিল সে একা একবারেই অসহায়, দাদা বাবুকে আজই বলিতে হইবে, তাহা না বলিলে নায়েবের অসৎ অভিপ্রায় হইতে সুধাকে রক্ষা করা অসম্ভব। সিধু তখন ক্রোধ ও ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইতেছিল, আপনার দুর্ব্বলতা ও নায়েবের প্রবল প্রতাপ যতই সে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল ততই তাহার ক্রোধ ও ঘৃণা বৃদ্ধি পাইতেছিল। সে বদ্ধমুষ্টি হইয়া আপনাকে ধিক্কার ও নায়েবকে অভিশাপ দিতেছিল। এ দিকে দেবিদাস হরিমোহন বাবুর বাটী হইতে ফিরিতেছে না। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

সুধাদের বাটীর পশ্চাতে কিছু দূরে একটা জঙ্গল। জঙ্গলে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। তখন ঐ দিকে লোকসমাগম একবারেই নাই। কতকগুলি বিকটাকার পাইক ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা মশাল জ্বলিতেছিল। মশালের আলোকে অন্ধকারটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল এবং বৃক্ষচূড়ে জটলা করিয়া কি উপায়ে ঐ মশালটাকে দূর করিয়া দিবে তাহার পরামর্শ করিতেছিল। দূরে বৃক্ষ লতাগুল্মাদির অন্তরালে তাহারা বসিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল—সে বিকট চীৎকার যে শুনে তাহারই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; সে চীৎকার শুনিলেই লাঠি ঢাল তলোয়ার চক্ষের সম্মুখে আসে, যমদূতাকৃতি ডাকাতের কথা মনে হয়, আর তাহার সঙ্গে সর্ব্বনাশের কথা মনে হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া

উঠে। আর একজন লোক মশাল লইয়া ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করিল। সে কি একটা ইসারা করিল। সকলেই জঙ্গল হইতে বাহির হইল। মশালের আলোকে ও তাহাদের গোলমালে চকিত হইয়া একটা পেচক জঙ্গল হইতে তাহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল।

সুধা দেবিদাসের বাটী হইতে আসিয়া খাইতে বসিয়াছিল। খাইতে খাইতে সে বৈকালের কথা স্মরণ করিতেছিল। তাহার মনের ভিতর তখনও একটা আতঙ্ক ছিল, কিন্তু যখন সে মনে করিতেছিল সিধু তাহার একান্ত আপনার, তখন ভয়ের মধ্যেও সে সিধুকে স্মরণ করিয়া মনে মনে হাসিতেছিল। একটা গভীর আনন্দ তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছিল। ভয় ও আনন্দে সে এতই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, যে সে কি খাইল এবং কি করিয়া এত শীঘ্রই খাওয়া শেষ করিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। আহার শেষ করিয়া সে জলের পাত্র মুখে তুলিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের চালের উপর বসিয়া একটা পেচক বিকটভাবে শব্দ করিয়া উঠিল। তাহাদের গোয়ালে একটা গরু বাঁধা ছিল। সে ভয় পাইয়া দড়ি ছিঁড়িয়া উঠানে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করিল। তাহার পর দরজা খোলা পাইয়া গরুটা বাহির হইয়া গেল। সুধা তাড়াতাড়ি জলের পাত্র রাখিয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। পেচকটা আরও দুইবার বিকট শব্দে ডাকিল। সুধা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, তাহার হৃৎপিণ্ডটা খুব তাড়াতাড়ি স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে কি

করিবে, স্থির করিতে পারিতেছিল না, তাহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। এমন সময়ে কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল, পালিয়ে আয়, শীগ্‌গির পালিয়ে আয়। তাহার বোধ হইল সিধু তাহাকে পলাইয়া আসিতে বলিতেছে, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে ছুটিয়া গেল। গরুটা তখনও রাস্তার এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। সুধাকে দেখিয়া তাহার নিকট আসিয়া বস্ত্রাঞ্চল ঘ্রাণ করিল। সুধা তাহার দিকে না চাহিয়াই সিধুর নিকট দ্রুতপদে চলিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সিধু যেন তাহাকে বার বার ডাকিতেছে।

অপরাধ কাহার

সিধু এতক্ষণ বারাণ্ডায় বসিয়া ঘৃণা ও ক্রোধে জর্জ্জরিত হইতেছিল। যতই দেবিদাস ফিরিতে বিলম্ব করিতেছে, ততই সে অস্থির হইতেছিল। তাহার রাগ ও ঘৃণা চরম সীমায় পৌছিয়াছে, এমন সময়ে নায়েব তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সে কট মট করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিল। নায়েব তাহা দেখিল না, সে একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে চাহিয়া কাহাকে খুঁজিতেছিল। সিধু আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে উঠিয়া পড়িল।—একবার

তাহার দুই পা কাঁপিয়া উঠিল। সে তাহা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নায়েবের পশ্চাতে অগ্রসর হইল। দূরে দুই তিনটা মশালের আলোক হঠাৎ দেখা গেল। নায়েব পশ্চাতে আর না চাহিয়া খুব দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। সিধু সেই মশাল কয়েকটার অস্পষ্ট আলোকে কয়েক জনের হাতে দুই তিনটা লাঠি দেখিল। সিধুর তখন বুঝিবার আর কিছু বাকী রহিল না, সে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে লাগিল। একবার চক্ষু মুদিয়া সুধার মুখ স্মরণ করিল; আকাশের দিকে চাহিয়া হৃদয়ের অন্তরাল হইতে সে একবার অধীর ভাবে কহিল—পালিয়ে আয়, শীগ্‌গির পালিয়ে আয়। তাহার পর অসুরের বল পাইয়া সে প্রাণপণে ছুটিল এবং অবিলম্বেই নায়েবের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহার হাতে কিছুই ছিল না, কিন্তু সে তখন আপনাকে অসুরের মত বলবান্ মনে করিতেছিল। পশ্চাৎ হইতে সে তাহার কাপড় দিয়া নায়েবের গলা জড়াইয়া ফেলিল, কহিল—ফের বেটা!

নায়েব ভয় পাইয়া ভগ্ন কণ্ঠে কহিল—কে ও?

সিধু তখন তাহার গলায় কাপড়ের একটা শক্ত পাক দিয়া খুব জোরে টানিল।

নায়েব ভূমিতে নিপতিত হইল। এক মুহূর্ত্তের জন্য সে ছট ফট করিল, তাহার পর তাহার দেহ অসাড় হইয়া গেল। সিধুর তখন চৈতন্য হইল, সে নায়েবকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সে তাহাকে প্রাণে মারিতে চাহে নাই; সে

তাহাকে সুধার নিকট হইতে ফিরাইতে চাহিয়াছে মাত্র! একি সর্ব্বনাশ হইল, সে যে নায়েবকে মারিয়াই ফেলিল! সে দেহে জীবন আছে কিনা দেখিতেছিল, এমন সময়ে সুধা রাস্তার একপাশ হইতে ডাকিল—সিধু, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস্! শুয়ে কে?

সিধু কহিল—সুধা এলি? চল্, শীগ্‌গির চল্। দুজনে দেবিদাসের বাটীর দিকে ছুটিতে লাগিল। সম্মুখ দিয়া না যাইয়া তাহারা পিছন দিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে দেবিদাসের বাটীতে ঢুকিল। এদিকে পাইকরা অনেকক্ষণ সুধার ঘরের সম্মুখে নায়েবের জন্য অপেক্ষা করিল। তিনি একজন পাইককে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন, শীঘ্রই তিনি আসিবেন, অথচ তিনি এখনও আসিলেন না কেন? ইহা তাহারা পরামর্শ করিতেছিল। অবশেষে স্থির হইল পাইকদের মধ্যে দুই জন নায়েব কতদূর আসিলেন খোঁজ লইতে যাইবে। বাকী সকলে ঐ খানে অপেক্ষা করিবে। দুইজন অন্ধকার পথ দিয়া জোরে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের হাতে তখন লাঠি বা মশাল কিছুই ছিল না; বীরেনও তখন ঠিক ঐ পথ দিয়াই রাত্রির পাঠশালায় যাইতেছিল। চিত্ত পূর্ব্বেই পাঠশালায় পড়া আরম্ভ করিয়াছিল, বীরেন তাহাকে সাহায্য করিতে যাইতেছিল। পথে মৃতদেহ দেখিয়া বীরেন এদিক ওদিকে চাহিতেছে, এমন সময়ে কিছু দূরেই রাস্তায় দুই একজনের কথা শুনিতে পাইল। তাহাদের জন্য সে অপেক্ষা

করিতে লাগিল। নিকটে আসিলে সে তাহাদিগকে ডাকিয়া মৃতদেহ দেখাইল, তাহাদিগকে কহিল সে এখনি উপস্থিত হইয়া মৃতদেহ দেখিল। মৃতদেহ দারোগার নিকট লইয়া যাইতে তাহাদিগকে উপদেশ দিল। বীরেন পাঠশালায় গেল। পাইকরা সকলেই আসিয়া মৃতদেহ লইয়া থানায় গেল।

তাহার পর যথারীতি বিচার হইয়া বীরেনের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। সে শোচনীয় ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আর লিপিবদ্ধ করা হইল না।

আত্ম-বোধ

সকলেই গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া আবার আপনাপন কাজে যোগ দিল। চিত্ত বীরেনের জন্য কয়েকদিন খুব কাঁদিল, শেষে বীরেনের কাজটাকে আপনার কাজ মনে করিয়া অক্লান্ত ভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে লাগিল। দেবিদাস স্বকাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শুধু রমেশ মনের ভিতর অবিরত একটা আকুল ক্রন্দন শুনিতেছিল, তাহার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম সে আকুল ক্রন্দনে ভাসিয়া গেল।

বীরেনের সহিত রমেশ একসঙ্গে তাহার কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, আজ বীরেন নাই রমেশ তাহার কর্ম্মের মধ্যে একটা মহাশূন্য দেখিতে পাইল। সে শূন্যতা তাহার

নিকট অত্যন্ত নিদারুণ বোধ হইল। একটা অভাব, বেদনা তাহার হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল। কর্ম্মে আর তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে একটা শূন্যতা, একটা অভাব, ও অভাবজনিত একটা ব্যাকুল ক্রন্দন উঠিয়া জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইল।

বাতাসের শব্দ, তরুমর্ম্মরধ্বনি সবই তাহার আকুল ক্রন্দনকে প্রতিধ্বনিত করিল। সততই তাহার মনে অন্তিম কালে বীরেনের সেই আবেগপূর্ণ মুখ জাগিয়া উঠিতেছিল।

বীরেন যেন সততই হাসিতে হাসিতে তাহাদের নিকট বিদায় চাহিতেছে, আর সে তাহাকে কিছুতেই বিদায় দিতে পারিতেছে না। যাহার সহিত হাত ধরিয়া সে কর্ম্মপথে চলিতে আরম্ভ করিল, তাহাকে কি বলিয়া পথের মাঝখানে নিষ্ঠুর ভাবে পরিত্যাগ করিয়া চলিবে! সে কিছুতেই বিদায় দিল না। শেষে সে তাহার অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়া আপনি মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল তখন তাহার মুখ কি সৌম্য, কি শান্ত, কি উজ্জ্বল দেখাইল! তাহার অন্তিম কালের হর্ষোৎফুল্ল মুখ, তাহার ঈষৎ নিমীলিত নয়ন, রমেশ প্রত্যক্ষ দেখিতেছিল এবং তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে একটা হাহাকার উঠিয়া বাতাসে মিশিয়া যাইতেছিল। কতদিন এইরূপে কাটিল। সে কাজ করিতে চেষ্টা করিল, কর্ম্মের উত্তেজনার মধ্যে তাহার দুঃখ ভুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কাজ করিতে করিতেও তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিত, তাহার শোকার্ত্ত হৃদয়

অবসন্ন হইয়া আসিত, কাজে তাহার স্ফূর্ত্তি ছিল না। সে বেশী কথা কহিতে এখন ভাল বাসেনা, অবসর পাইলেই একলা আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ায়। হৃদয়ের সহিত কথা কহিয়া তাহার দুঃখভার লাঘব করিতে চেষ্টা করে।

একদিন অনেক দূর এরূপে সে চলিয়া গিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। একটা ছোট নদীর ধারে সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। প্রশান্ত জল। শুধু কূলে আসিয়া জল একটু চঞ্চল হইয়া অশ্রান্ত ভাবে কুল কুল শব্দ করিতেছিল। ধীর বাতাস। উপরে উদার উন্মুক্ত আকাশ। চারি দিক্ শান্ত ও বিষাদপূর্ণ। কাহার জন্য সে কাঁদিতেছিল। সে এখানে নাই। ঐ সুদূরে যেমন কুটীরে আলো জ্বলিয়া আবার নিবিয়া গেল, সেরূপ দুদিনের জন্য সে আসিয়া আপনার হৃদয়ের অন্ধকার গাঢ় করিয়া আবার চলিয়া গেল। আপনার হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার কি দূর হইবে না! হৃদয় কিছুতেই বুঝে না। কতক্ষণ সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

নদীর তরঙ্গগুলা তটকে আঘাত করিয়া কোন্ দূরে চলিয়া গেল, সমস্ত জঞ্জাল কোথায় ভাসাইয়া লইয়া নদী অনন্তের দিকে ছুটিল। মানুষও সেরূপ অনন্তের পথে ছুটিতেছে, আত্মীয় স্বজন তাহাকে নদীতটের মত বাঁধিয়া রাখিতে চাহে, সে বাঁধন ভাঙ্গিয়া ছুটিতেছে! নদী-তট ক্ষণকালের জন্য তরঙ্গকে ধরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে পরক্ষণেই হাসিয়া ছলিয়া তাহাকে আঘাত করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তটের দিকে

ফিরিয়া চাহিতেছে না। সমস্ত সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা তটের স্মৃতির মত এক অকূল সাগরে বিলীন হইবে, এক ভৈরব কল্লোলে জীবনের যত ক্ষুদ্র তান একেবারে নিঃশব্দ হইবে। জীবনের সেই খানেই সমাপ্তি, সেই খানেই পরম আনন্দ। সেই সমাপ্তির কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয় একটু আসান পাইল। এ আনন্দ সে বহু কাল পায় নাই, তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল। সে অতদূর কখনও যায় নাই এবং সে গ্রামও তাহার অপরিচিত ছিল। যে কুটীরে সে আলো দেখিয়াছিল, সেখানে সে রাত্রির জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিল। সে আশ্রয় পাইল। কৃষকরমণী সে রাত্রে গম পিষিতেছিল। সে তৃণশয্যায় শুইয়া অনেকক্ষণ গম পেষা দেখিতেছিল। সে ভাবিতেছিল,—মানুষের জীবনও ঠিক এই গমেরই মত পেষিত হইতেছে। জাঁতার উপরকার পাথরের মত ঘূর্ণ্যমান ও চঞ্চল সংসার; নীচেকার পাথরের মত অচঞ্চল সমাজ; এই দুইটীর মধ্যে পড়িয়া মানুষের জীবন ক্রমাগতই চূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু এই যে চূর্ণ হওয়ার বেদনা, এই যে আপনাকে সংসারের সকলের মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া বিলাইয়া দেওয়া, আপনাকে ধ্বংস করার দুঃখ, ইহাই তাহার জীবনের দীক্ষা; ইহাই তাহাকে মরণের পথ দিয়া বাহির করিয়া বিশ্ব জগতের ভোগে লাগিবার উপযুক্ত করিতেছে। সে এই ভাবে জীবভোগ্য এবং সর্ব্বশেষে দেবভোগ্য করিয়া তাহার জীবনকে চরম সার্থকতা প্রদান করিতেছে। সে

ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। আজ তৃণশয্যায় তাহার যে ঘুম হইল বহুকাল সেরূপ সে ঘুমায় নাই।

সেবা ও সাধনা

রমেশের জন্য সকলেই গত রাত্রি হইতে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল। তাহারা, মাষ্টার মহাশয়ের বাটীতে, উহাকে খুঁজিবার জন্য কে কোন্ দিকে যাইবে ইহা পরামর্শ করিতেছিল, এমন সময়ে রমেশ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। রমেশের মুখে বিষাদের চিহ্ন না দেখিতে পাইয়া সকলেই মনে মনে খুব আনন্দিত হইল। কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না। রমেশ যেন একবারে নূতন মানুষের মত তাহাদের সম্মুখে আসিল। তাহাদের সকলেই কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে আবার আলোচনা করিতে লাগিল। নূতন আর কোন্ কাজে হাত দেওয়া যাইতে পারে, রমেশ তাহার সম্বন্ধেও কিছু বলিল। সকলেই একটু অবাক্ হইল। রমেশ এক দিনে কোথায় যাইয়া এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল, কেহই তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাহার যে অত দুঃখ হইয়াছিল, সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। মাষ্টার মহাশয় কতদিন তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,

কিন্তু সফল হন নাই। আজ রমেশ শান্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ হইল।

বৈকালে আবার সকলেই মাষ্টার মহাশয়ের বাটীতে সমবেত হইয়াছে। চিত্ত তাহার বিদ্যালয়ের কয়েক জন ছাত্রের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। ছাত্রদের মধ্যে দুই তিন জনও ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা একে একে একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া গেল; এক জনের আবৃত্তিকে তাহারা বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। চিত্ত তাহাদের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইল, তাহাদিগকে ছাত্রাবাসে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া আরও প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিল। রমেশ দেবিদাসকে কহিল—আমার বোধ হচ্ছে এই ছেলেটী ভদ্র ঘরের, নীচ জাতের নয়। ওকেই ত আমরা সেই দুর্ভিক্ষের সময়ে রুগ্ন অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, নয়? দেবিদাস কহিল—হাঁ, ওর কি জাত বলেছিল তোমার মনে আছে? রমেশ কহিল—না মনে নাই, চিত্ত তুই জানিস্? চিত্ত কহিল—ওর জাত সে কিছুই বলতে পারে না। তার মা বাপকেও তার মনে নাই। সে তার মাসির বাড়ীতে ছিল। রমেশ কহিল—ওর গলার স্বর, ওর বুদ্ধি যেমন, তা দেখে আমি ঠিক বলছি ও ভাল জাতের ছেলে। চিত্ত কহিল—আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোর মা বাপ আছে কিনা জানিস্?' সে বল্লে তার মাসি তাকে বলেছিল তাকে মার কাছে নিয়ে যাবে—মাসির তখন

ভারী অসুখ। তার পর মাসি কোথায় গেল সে জানে না। তার মাও কোথায় থাকে কিছুই জানে না। তার মা নিশ্চয়ই আছে। খোঁজ করে দেখা উচিত।

হঠাৎ দেবিদাসের, মনের ভিতর একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিল। একবার মনে মনে ভাবিল, গুরুচরণ যে ছেলেটির কথা বলেছিল, সে নয় ত? তার কথা সেত অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন ক্ষণকালের জন্য মনে করিল ঐ ছেলেটিকেই গুরুচরণ খুঁজিতেছে। কিন্তু তাহার মনে অবসাদ আসিল, যখন সে স্মরণ করিল যে ছেলেটি এত ছোট কখনই হইতে পারে না। গুরুচরণ বলিয়া দিয়াছিল তাহার বয়স এখন কুড়ি হইতেও পারে। অনেকক্ষণ পরে রমেশ কহিল—দেখুন, মাষ্টার মহাশয়, আমার মনে হয় আগে আপনাকে তৈয়ারী না করে পরের সেবা করতে নাই। আমি এত দিন পরে আমার জীবনের খুব একটা বড় ভুল বুঝতে পারলাম। মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—কি ভুল, ভুলটা কি করে ধরলে? রমেশ কহিল—আমি এত-দিন আমার নিজের মনের দিকে না চেয়ে পরকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। কত লোকের সেবা করেছি, কত রোগীকে শুশ্রূষা করেছি, কত রোগীকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করেছি, কত রোগী আমার সম্মুখে পড়ে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের এক বন্ধু মারা গেল অমনি আমাদের হৃদয় শোকে উথলে উঠল! অন্য লোক মারা গেলে আমাদের ত এত দুঃখ হইত না।

আমার নিজের এমন দুঃখ হয়েছিল যে একবারে আত্মসংযম হারিয়েছিলাম। সমস্ত কাজ কর্মকে, দুঃখ একেবারে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল। আমি এতদিন মনে করতাম কাজটা আমার জীবনের চরম লক্ষ্য, কাজেই আমার পরম শান্তি, কিন্তু এ দুঃখ পেয়ে কাজটা হাল্কা হয়ে তুলার মত উড়ে গেল। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম, একবারও ভাবি নাই কাজের গোড়া পত্তনটা কেমন গড়া হয়েছে। দুঃখ এসে যখন গোড়া পত্তনটা ভেঙ্গে দিলে তখন কাজে আর শান্তি পেলাম না। মনই কাজের গোড়া পত্তন, মন না গড়ে কাজে নামতে নেই।—দেবিদাস কহিল—তা কেন? কাজ করতে করতে মন আপনা আপনিই গড়ে উঠে। ডাঙ্গায় বসে সাঁতার শিখে তার পর জলে নামব, এ যেমন কথা, আগে মন গড়ব তার পর কাজে নামব এও সেই রকম। জলেই সাঁতার শিখতে হয়, তেমনি কাজের মধ্য দিয়েই মনকে গড়তে হয়।

রমেশ কহিল—আমিও আগে তাই ভাবতাম। এখন দেখছি আমরা কাজের ভিড়ের মধ্যে মনটাকে একবারে হারিয়ে ফেলি। মনকে না খুঁজে শেষে অনুতাপ করি। সাঁতার শিখতে গিয়ে অতল জলে নেমে হাবুডুবু খাই। জলে খুব হাত-পা ছুঁড়ি, শেষে হয়ত ডুবে মরি। আমি এই কদিনে স্পষ্ট বুঝেছি, মন না গড়ে কাজে নামলে, কাজে শান্তি থাকে না, শুধু অসংযম, কোলাহল হয়। মনেও সেরূপ আনন্দ পাওয়া যায় না। দেবিদাস কহিল—আমার ত তা হয় না।

আমি ত কাজে খুব আনন্দ পাই। আমার নাম যশ বাড়ছে কি না বাড়ছে তার দিকে আমি চাই নি। আমি রোগী দুঃখী দরিদ্রের সেবা করে এমন একটা আনন্দ পাই যা হতে আমার মন কিছুতেই বিচলিত হয় না। আমাদের বন্ধুকে আমরা হারালাম। দুঃখ হয় নি বললে মিথ্যা কথা বলা হয়। কিন্তু আমি কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, দুঃখ কোথায় চলে গেল। রমেশ কহিল—আমার বোধ হয় তোমার মনকে তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, দুঃখের সঙ্গে বোঝা পড়া করা উচিত, ওকে চাপা দেওয়া ঠিক নয়। ছাই ঢাকা আগুন যে কখন্ জলে উঠবে তার ঠিক নেই। যাক্—তোমার মন তুমি নিজেই ভাল বুঝবে। আমি কি বলব। মাষ্টার মহাশয়, আপনি কি বলেন, কাজের ভিতর দিয়েই কি মন গড়ে উঠে? মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—সব সময়ই মন যে কাজের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠ্‌বার সুযোগ পায় তা নয়। অনেক সময়েই কাজের গোলমাল চরিত্রগঠনের অন্তরায় হয়। আমরা হিন্দু; হিন্দু চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা আগে করেছে; তার পর ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হয়ে গেলে তার কাজ কর্ম্মেরও ব্যবস্থা দিয়েছে। আমাদের আগে শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, তার পর কাজকর্ম্ম, গার্হস্থ্য জীবন। ব্রহ্মচারীর ব্রত চরিত্র-গঠন, গৃহস্থের ব্রত—সমাজসেবা। আগে চরিত্রগঠন, তার পর সমাজসেবা। ব্যক্তিজীবনে হিন্দু এই ক্রমবিভাগই নির্দ্দেশ করেছে। তার পর ব্যক্তিজীবনে এমন সময় আসে

যখন গৃহীর সমাজ সেবা চরিত্রের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়। তখন সে সংসার ত্যাগ করে ধ্যান, ধারণা, শিক্ষা, দীক্ষা, প্রভৃতির দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে চরিত্র গঠন ও সেবা করিবার অধিকার লাভ, গার্হস্থ্য আশ্রমে নিষ্কাম সেবা ব্রত ও নিষ্কাম সেবার মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠন, পরবর্ত্তী আশ্রমে শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতির দ্বারা সমাজ সেবা ও মুক্তিসাধন—এই উপায়েই হিন্দু আপনার নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন ও সমাজের মঙ্গল সাধন করিত।

চিন্তা জিনিসটা কর্ম্মকে ছেড়ে নিজেকে যদি নিঃসঙ্গ করে ফেলে তাতে সেই মানুষের জীবনও নিঃসঙ্গ হয়ে উঠে, তখন মানুষের চিন্তাই সর্ব্বস্ব হয়ে উঠে, কাজ করবার প্রবৃত্তি আর থাকে না। বুদ্ধদেবের জীবনে প্রথমটা চিন্তার নিঃসঙ্গত্ব এসে ছিল। কিন্তু তিনি শেষে বুঝেছিলেন যে নিজেকে কর্ম্ম জগতের বাইরে একটা তত্ত্বময় জীবনের মধ্যে বদ্ধ করে রাখলে মানুষ কিছুতেই প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। জীবনের চরম লক্ষ্য-ধ্যান-ধারণা-ময় একটা অপ্রাকৃত কূটস্থ জীবন লাভ করা নয়। তাহার চরম লক্ষ্য ভাল লোক হওয়া, সমাজ সেবক, ত্যাগী কর্ম্মী হওয়া। তাই তিনি যখন বুদ্ধত্ব লাভ করলেন অর্থাৎ আধ্যাত্ম জীবনের নিদ্রা হতে প্রবুদ্ধ হলেন তখন তিনি দেখলেন যে জগতের জীব জড় সমস্ত নিয়ে, সমস্তর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেই মানুষ মানুষ হয়। অর্থাৎ বুদ্ধ হয়ে চোখ মেলে তিনি মানুষকে বাহিরে সমাজ সংস্কার প্রভৃতির দিকেই চেয়ে দেখতে বললেন।

রমেশ কহিল—আমরা শিক্ষা, দীক্ষা কিছু লাভ করি নাই, আমাদের চরিত্র গঠন হয় নাই, অথচ আমরা মনে করছি আমরা নিষ্কাম সেবাব্রত ধারণের অধিকারী হইয়াছি ;—এইটা প্রধান ভুল।

দেবিদাস কহিল—রোগ দুঃখ দৈন্য যন্ত্রণার মধ্যে কাজ করতে করতে মানুষের মনে স্বভাবতঃই একটা বৈরাগ্য না এসে পারে না। কাজটা হয়ত আরম্ভে সকাম ছিল, শেষে নিষ্কাম হবেই। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁর চরম জ্ঞান লাভ করেছিলেন,—শিক্ষা দীক্ষা হইতে নহে, মানুষের রোগ দুঃখ মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করে। দীন হীন পতিতদের মধ্যে কাজ করতে করতেই মানুষের মন স্বভাবতঃই একটা নম্র, নীরব বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, তখন তার আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব সহজ হয়।

বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য সকলেই এইজন্য দীন দরিদ্র পাপী তাপীদের খুব ভাল বাসতেন। তাঁরা বলতেন—ইহাদের সেবা করতে শিখলে ভগবানের সেবায় অধিকার হয়। প্রেম ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর প্রেমধর্ম্মের শিক্ষাই—সেবা।

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—সেরূপ সাধনা না থাকলে দীন দরিদ্রকে ভগবান্ বলে সেবা করা খুব কঠিন। ভগবানের সর্ব্বভূতে আমি, আমাতে সর্ব্বভূত, এই কথার উপলব্ধি করার পূর্ব্বে অনেক সাধনার প্রয়োজন। সেবার ভিতর দিয়ে যে হয় না, তা আমি বলছি না। কিন্তু এটা মনে ধরে রাখতে হবে, যে সেবা যদি সাধনার অঙ্গ না হয় তবে সেটা কোলাহল

ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাহাই চরিত্র গঠনের প্রধান, অন্তরায়।

দেবিদাস ভাবিতে লাগিল, তাহার জীবনে সে সেবাকে সাধনার অঙ্গ করিতে পারিয়াছে কি না। সে উঠিয়া পড়িল, আপনার বাটীর দিকে চলিতে লাগিল। তাহার মন বাটীর দিকে ছিল না; একটা দুরূহ প্রশ্নের তাহাকে মীমাংসা করিতেই হইবে—এই প্রশ্নটাই তাহার মনকে অধিকার করিয়াছিল। যখন তাহার বাটীর ঘরের টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া সে উপবেশন করিল তখন তাহার বোধ হইল সে পথটা যেন বিনা আয়াসেই হাঁটিয়া আসিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া সে ভাবিল, এইবার বুঝি সে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিবে। ভাবের পর ভাব আসিয়া তাহার হৃদয়কে অভিভূত করিল, সে কোন কূল কিনারা পাইল না। অবশেষে ভাব গুলিকে সংবদ্ধ করিবার জন্য সে টেবিলের সম্মুখস্থ দৈনন্দিন লিপির আশ্রয় লইল। লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাহার চিন্তাগুলি বেশ স্পষ্ট হইয়া আসিল। তাহার চিন্তাধারা কিরূপভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল আমরা তাহা তাহার দৈনন্দিন লিপি হইতে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রেম ধর্ম্ম

২রা অগ্রহায়ণ—এই বিশ্ব সংসারে সমস্ত জীবের মধ্যে যে ভগবানের প্রকাশ, হিন্দু ধর্ম্ম ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছে; কিন্তু এই অনুভূতি অনেক সাধনা সাপেক্ষ। আব্রাহ্মণ চণ্ডালে যে পরম পুরুষের অধিষ্ঠান, ইহা উপলব্ধি করা সাধনার চরম লক্ষ্য। হিন্দুসমাজ এই জ্ঞানের বিকাশের সুযোগ বিধান করেছে। শুধু মানুষ নহে, কীট পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম সবেতেই যে ভগবানের স্বরূপ পাওয়া যায়, এই জ্ঞান হিন্দু সমাজ বিকাশ সাধন করেছে।

আমরা মহাদেবীর সহিত যে সিংহের পূজা করি, লক্ষ্মীর সহিত যে পেচকের পূজা করি, সরস্বতীর সহিত যে হংসের পূজা করি, কার্ত্তিকের সহিত যে ময়ূরের পূজা করি, গণেশের সহিত যে ইঁদুরের পূজা করি, আমাদের ব্রহ্মার সহিত হংসের পূজা, বিষ্ণুর সহিত গরুড়ের পূজা, মহাদেবের সহিত বৃষের পূজা, এ সকলেরই মূল আমাদের বিশ্বাস ভগবানের স্বরূপ শুধু মনুষ্যে নহে, সব জীবেই প্রকাশিত। আমরা যে বিশ্বাস করি, মানুষ আপনার কর্ম্মফল অনুসারে প্রাণী ও কীট পতঙ্গের দেহ অবলম্বন করে, স্বয়ং বুদ্ধদেব যে সমস্ত প্রাণিদেহ অবলম্বন করে শেষে মনুষ্য শরীর লয়ে প্রাণী হিংসা বিরোধী ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, এখনও যে জৈনগণ ঈর্য্যা, ভাষা, এষণা, আদান,

নিক্ষেপণ ও উৎসর্গ প্রভৃতি পাঁচ সমিতি অবলম্বন করিয়া অহিংসা ধর্ম্মসাধন করেছেন, আমরাও যে নবান্নের দিন কাক কুকুরকে ভোজন না করিয়ে অন্ন গ্রহণ করি না, ইহাদের মর্ম্ম আর কিছুই নহে—ভগবান্ সর্ব্বভূতে, এই তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মহত্ত্ব আমরা এখন ভুলেছি। তত্ত্বের গভীরতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। দেশের হৃদয়কে একবার ঐ তত্ত্বের মহিমার দিকে চালিত করতে হবে। এত বড়, এত মহৎ, এত গভীর, একটা তত্ত্ব আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম, আর তাকেই আমরা এখন ছেড়ে দিয়াছি। আমাদের মাথা হেঁট ইহাতে হইবে না ত কিসে হবে? নিজের হৃদয়ের জিনিষের সহিত শ্রদ্ধা হারাইলে আমরা ছোট হব না কি বড় হব? হিন্দুর সংসার ছিল শুধু আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার নহে, শুধু আব্রাহ্মণ চণ্ডাল অতিথি লয়ে নহে, শুধু মানুষ লয়ে নহে, হিন্দুর সংসার ছিল, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ লয়ে—এত বড় একটা সংসার হিন্দু পেতেছিল।

আর সে সংসার কিসে পরিণত হয়েছে? এখন সংসারে আপনি ও আপনার স্ত্রীপুত্র ছাড়া আর কেহ নাই। হিংসা দ্বেষ রেষারেষি হিন্দুর সোণার সংসারকে ছারখার করেছে। সেবা, মৈত্রী, করুণা সে সব কোথায়? দলাদলি, রেষারেষি, জয় পরাজয়, হিন্দুর যুগযুগান্তরের কত সাধনা, কত প্রয়াসকে হিংসার অতলস্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ করে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করেছে। হিন্দু এখন প্রেমের ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়েছে, হিংসা

ধর্ম্মকে বরণ করেছে, দেশের পর্ণ কুটীরে এখন কপোত যুগল সুখে বিশ্রাম করে না, সেখানে বসিয়া এখন শোণিতপিপাসু শ্যেন পক্ষী আপনার আহার খুঁজছে। অত্যাচার, নির্য্যাতন, দুর্ব্বল পীড়ন, ইহাই এখন ধর্ম্ম। হতভাগ্যের করুণ ক্রন্দন, দীন দরিদ্রের কাতর আর্ত্তনাদে আমার হৃদয় এখন কম্পিত হয়ে উঠছে। আর পারি না শুনতে—এই মর্ম্মস্পর্শী সহস্রধা-ভিন্ন-হৃদয় দীন দরিদ্রের করুণ ক্রন্দন। এই ক্রন্দন শুনতে শুনতে আমি উন্মাদ হয়ে পড়ছি। ভগবান্ তুমি আমাকে প্রেম দিয়েছ, আমাকে পরের ক্রন্দন শুনে কাঁদিতে শিখিয়েছ, আমাকে শক্তি দাও নাই কেন ?

আমি কত দীন দরিদ্রের সেবা করলাম, এখনও যে নিত্য নূতন হাহাকার উঠছে। এ যে অনন্ত হাহাকার, অনন্ত ক্রন্দন! আমি যে অল্পশক্তি, কত কাজ করব, হাজার হাত দিয়া সেবা করলেও যে ক্রন্দন থামবে না, এ যে অসাধ্য সাধন। দীন হীন কাঙ্গাল আমি, আমি কি দিয়ে সেবা করব—আমার শক্তি নাই, অর্থ নাই, আমি যে নিজেই একজন পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক। ভগবান্ হৃদয়ে করুণা দিয়ে তুমি কি আমাকে শুধু যন্ত্রণা উপভোগ করিয়ে উন্মাদ করবার জন্য সৃষ্টি করলে ?

আমি প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, প্রেম ধর্ম্মের সাধন করছি। প্রেম আমাকে শক্তি দিবে। আমি বিশ্বজননীর কাছে, বিশ্বপ্রেম পেয়ে অসীম শক্তি পাব। আয় মা, প্রেমময়ী মা আমার, মা আমাকে সব প্রেম দে, আমার হৃদয়ে করুণা-

প্রবাহ অজস্র ঢেলে দে, তবেই ত আমি শক্তি পাব। তুই ত মা শক্তিপ্রতিমা প্রেমময়ী বিশ্বজননী, প্রেমময় ঋষিকীর্ত্তন গান করে তোকে বিষ্ণুর করুণারূপে পেয়েছিল, তোকেই ত তাঁর কমণ্ডলুতে অমৃত রূপে রেখেছিলেন! আর মহাদেব, যাঁর চরণ তলে সমস্ত দেবতা মস্তক নত করিয়াছে, তিনি তোকে তাঁর মস্তকে জটারূপে ধারণ করেছিলেন। তার পর ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সরস্বতী যমুনা-জলসম্পূর্ণা অমলা শীতলা কলুষহারিণী পতিতপাবনী জাহ্নবীরূপে তুই মর্ত্ত্যে অমৃত ঢালতে এসেছিস্! আয় মা হৃদয়ে আমার, তোর অমৃত-ধারায় আমার হৃদয় শীতল ও পবিত্র হউক—তোর জলকল্লোল আমার কর্ণে প্রেমমন্ত্র ধ্বনিত করুক। তোর সঞ্জীবনী স্পর্শে আমার দুর্ব্বল প্রাণে শক্তিসঞ্চার হউক—তখন আমি করুণা ধারায় জগৎ ভাসিয়ে বেড়াব, জগতের সমস্ত দুঃখ, শোক, তাপকে আমি শীতল করতে পারব, সমস্ত পাপ কলুষকে হরণ করতে শিখব, ক্ষত-বিক্ষত শতধা-ছিন্ন-অতুরের অঙ্গে অমৃত ঢালব, আমি তখন পতিতকে সান্ত্বনা দিতে, তাকে পবিত্র করতে শিখব, কঠিন হৃদয়ে প্রেমবারি সিঞ্চন করে তাকেও শ্যামলা ধরণীর মত প্রেম পুষ্প ফলে শোভিত করতে পারব।

করুণাময়ী মা আমার, দে আমাকে তোর সেই পতিতোদ্ধারিণী কলুষনাশিনী সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী শক্তি। আমার অঙ্গে অঙ্গে তোর ভীম তরঙ্গ অক্লান্ত আবেগে নেচে উঠুক, আমার অঙ্গের স্পর্শে পাষাণহৃদয় শতধা ছিন্ন হউক, পাষাণ

দ্রবীভূত হউক। তোর অনন্ত তরঙ্গের মত আমাকে অনন্ত হস্ত দে, আমার অনন্ত হস্ত দিয়ে সেবা না করতে পারলে এ জগতের দুঃখ যন্ত্রণা যে দূর হবে না, এ জগতের পাপ তাপ যে শীতল হবে না। তোর অমল, শীতল অনন্ত তরঙ্গের দুর্নিবার আকুল আবেগে আমি এই কঠিন জগতের উপর উচ্ছ্বসিয়া পড়তে চাই—তবে আমার হৃদয় জুড়াবে, তবে জগৎ জুড়াবে।

বিশ্বমাতৃকা

৩রা অগ্রহায়ণ—আমার সেবা-বাসনা একটা জ্বালাময় তৃষ্ণা হয়েছে। সাবধান মন, দেখিস্ তুই যেন বিপথে না যাস্। সেই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিস্ সেবা যেন তোর সাধনা হয়। সেবার তৃষ্ণা তোর বিকার নয় ত? তুই যে সেবা করছিস্, আপনার প্রেয় জ্ঞানে না শ্রেয় জ্ঞানে? তুই ভাবিস্ যে তুই আনন্দ পাস, ভেবে দেখিস্ সে আনন্দ ক্ষণিকের জন্য, সে আনন্দ অপূর্ণ, না সে আনন্দ শাশ্বত, পূর্ণ। না,—আমি শ্রেয় জ্ঞানে সেবা করি না, আমার ভালবাসা, সেবা ভক্তি আমি অযাচিত ভাবে দান করি, আমি দীন, দরিদ্র, দুঃখী-দিগকে আমার ভালবাসা অর্পণ করি, আর সেই অর্পণ করাই আমার দানের সার্থকতা—আমার আত্মদানেই তৃপ্তি, সেই তৃপ্তি আমার অন্তর জ্ঞান ও আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেয়।

কিন্তু সাবধান, মাঝে মাঝে অহঙ্কার যে হৃদয়ে আসে, তখন আমি তৃপ্তি পাই না, তৃপ্তির অবসানে যে জ্ঞান আসে তা পাই না, তখন অন্তর হতে একটা হাহাকার উঠতে থাকে। আমি মাঝে মাঝে দান করে কিছু গ্রহণ করবার জন্য অধিক ব্যাকুল হই, নিজের তৃপ্তির অনুসন্ধান করি; দেওয়াতেই যে দেওয়ার সার্থকতা তা মাঝে মাঝে ভুলে যাই, তখন সেবার আকাঙ্ক্ষা একটা চরম বিকার হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেবা একটা স্বার্থের ব্যাপার হয়ে উঠে। সেবার সহিত সাধনার তখন চরম বিয়োগ সাধিত হয়। সেবার দ্বারা আত্মদান না করে, আমি আমিকেই তখন প্রতিষ্ঠিত দেখতে যত্নবান্ হই। তখন জগৎ একটা জ্ঞানানন্দ পুষ্প ফলে সুশোভিত স্নিগ্ধ উপবন না হয়ে একটা শুষ্ক ভীষণ মরুভূমি হয়ে দাঁড়ায়। আমি উষ্ট্রের মত একটা কর্ত্তৃত্বের বোঝা পৃষ্ঠে লয়ে সেবা তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হয়ে যাহাকে মনে করি অমৃত সরোবর, তাহার দিকে ছুটতে থাকি, মনে ভাবি সুশীতল জল পাব, কিন্তু সে যে মৃগতৃষ্ণিকা। তখন কি তীব্র জ্বালা, কি ভীষণ যন্ত্রণা! আমার আমিত্বের মরুভূমে আমি তখন ছট্ ফট্ করতে করতে মৃতপ্রায় হই।

প্রেমময়ী জগৎজননী, তুমিই তখন এসে এই মরুভূমিতে প্রেম বারি সিঞ্চন করে অমৃত সাগরের সৃষ্টি কর, আমার মাথা হতে অহঙ্কারের বোঝা নামিয়ে দিয়ে আমাকে মুক্ত কর—আমাকে বুকে করে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে তিরস্কার কর—ছি ওদিকে

যেওনা, ও যে ভুল, ও যে মায়া-মরীচিকা—ওখানে গেলে মৃত্যু, আমার কোলে এস, তোমাকে প্রেম দেব, জ্ঞান দেব, জীবন দেব।

মা, তোমার বুকে এসে আমি তখন আমার ভুল বুঝতে পারি। আমার জ্বালার নিবারণ, যন্ত্রণার প্রশমন হয়, আমার হৃদয় প্রেমামৃত পান করে তখন তৃপ্ত হয়। আমার তখন অহঙ্কার থাকে না, আমার কথা তখন ভুলে যাই, আমিত্বের ক্ষান্তি হয়—আমি তোমার গলা আঁকড়ে জড়িয়ে থেকে, তোমার জ্ঞান—প্রেম—স্তন্য - পীযূষ পান করতে করতে অনুভব করি—এ জগৎটাই আমার সৃষ্টি, মা যেমন সন্তানকে স্তন্য দিতেছেন, তেমনি আমার নিজের রক্ত দিয়ে আত্মসৃষ্ট জগৎকে আমি পালন করছি! আমার সৃষ্টি জ্ঞান তখন উন্মেষিত হয়। আমার তখন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। মা যেমন সন্তানের মুখাপেক্ষী হয়ে তাহাকে পালন করে, আমিও সেইরূপ পালন ধর্ম্মে ব্রতী হয়ে আমার অস্তিত্ব হারাই, আমার শ্রেয় জ্ঞান তখন থাকে না, আমি শ্রেয় জ্ঞানেই বিশ্ব-মানবের তখন আরাধনা করি। মা যদি আপনার শ্রেয় জ্ঞান হতে সন্তানকে পালন করত, তাহা হলে সৃষ্টি রক্ষা হ'ত না। আমি মার নিকট পালন ধর্ম্ম শিখেছি, আমার অহঙ্কার গেছে, শ্রেয় জ্ঞান গেছে, মাতৃভাব সাধন করে আমার ভেদ বুদ্ধি অহঙ্কার গেছে, সন্ন্যাস এসেছে, আমার এখন দানেই দানের সার্থকতা। আমি এখন আত্মদানেই তৃপ্ত, বিশ্বমাতৃকার সন্তান হয়ে বিশ্ব-

মানবের সেবা করাই আমার সেবার সার্থকতা, ইহাতে আমার চরম আনন্দ।

এসো মা আনন্দদায়িনী বিশ্বমাতৃকা জগদ্ধাত্রিরূপিণী মা আমার, তোমার চরণ কমলের স্পর্শ ধরিত্রীর পাপ তাপকে শীতল করুক, শুষ্ক মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করুক, এসো মা সদানন্দস্বরূপিণি, দীন হীন অনাথ তৃষ্ণার্ত্তকে ডেকে অন্ন দাও মা, জল দাও মা, আনন্দ দাও মা—যে অন্ন জল একবার পেলে দুর্ভিক্ষ মহামারীতেও আমরা মৃত্যুঞ্জয় হব সেই অন্ন জল বিতরণ করে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা চিরকালের জন্য দূর কর মা তোমার করুণার বারি যমুনা সরস্বতী ভাগীরথী নর্মদা-সিন্ধু কাবেরী রূপে এ মরুভূমিকে অজস্রধারায় প্লাবিত করুক। তোমার ঈষৎ মরুৎহিল্লোলে আন্দোলিত কনক অঞ্চল দিগ্ দিগন্তে হরিদাভ শস্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়া দিক্, তোমার আলুলায়িত কুন্তলরাশি, ফল পুষ্পে সুশোভিত স্নিগ্ধ নিবিড় বনানী বিরচন করুক। বালার্কসিন্দূরশোভী, হাস্যপ্রফুল্ল উষার মত তোমার শ্রীমুখদীপ্তি নয়নরঞ্জন স্নিগ্ধ মধুর কিরণ-ধারা বর্ষণ করুক, তোমার স্নিগ্ধ হাসি সুষুপ্ত ধরণীর উপর মনো-মোহকর জ্যোৎস্নারাশি বিকীরণ করুক, তোমার শ্রী-অঙ্গ-সৌরভ দিক্‌বিদিকে অফুটন্ত পুষ্প সৌরভে সমীরণকে আমোদিত, উল্লসিত করুক। তোমার চরণপ্রান্তে উদ্বেলিত নিখিল জীবের হৃদয়সমুত্থিত অসীম ভক্তিতরঙ্গ, দুই হস্তে নিখিল জীবের শুভাশিষ দাত্রী বরাভয় মুদ্রা, কণ্ঠে বিজড়িত ভাবা-

ছন্দঃসূত্র-গ্রথিত সুললিত সাহিত্যের মুক্তাহার, হৃদয়ে বিলম্বিত জ্ঞানবিজ্ঞানসূত্রগ্রথিত প্রেম-করুণার মণি-মুক্তা-মালা। ধনধান্য, রত্ন-সম্পদ তোমার স্বর্ণচেলিরূপে ঝলমল করুক, তমাল-তালী-বনরাজি-সুশোভিত সাগরফেনরেখাঙ্কিত বেলাভূমি তোমার নানাবর্ণ দস্তুর বসন দিগন্তে বিস্তার করিয়া দিক্‌, তুষার-ধবলিত তুঙ্গ হিমগিরি, তোমার মঙ্গল-গর্ব্ব-কিরীট, ঊর্দ্ধ ব্যোমকে স্পর্শ করুক।

এস মা সর্ব্বদুঃখবিনাশিনি, জগত্তারিণি, তোমার বিশ্ব-পালিকারূপ একবার সন্তানের সম্মুখে প্রকাশ কর, আমাদিগকে তোমার স্নেহ-প্রেম-পীযূষ পান করাও—নিখিল সন্তান মিলে এক সঙ্গে এক মনে তোমার রক্তচরণ-কমল দুখানির উপর লুটিয়ে পড়ি।

চিরপৌর্ণমাসী কোমল, কিরণ-ঢালা আমাদের মা, একবার নিখিল-জীবের অনন্ত প্রসারিত ঘন-নীল-চিত্তাকাশে উদয় হও। আমরা বড় ক্ষুদ্র, বড় বদ্ধ, বড় অধীন, আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ চকোরের মত পিঞ্জরের কোণে বসিয়া তৃষ্ণার যন্ত্রণায় অধীর হয়েছি—একবার চন্দ্রকোটীসুশীতলা, জ্যোতির্ম্ময়ী, করুণাময়ী হয়ে নীলাম্বরে ভাস মা, আমাদের লোহার শিকল যখন আপনি স্খলিত হবে, পিঞ্জরের দ্বার আপনি খুলে যাবে, আমরা নিরানন্দ পিঞ্জর ত্যাগ করে, উদ্দাম-আবেগে মুক্ত-আকাশে ছুটব, মুক্ত পক্ষ প্রসারণ ক'রে মহাউল্লাসে তোমার দিকে ছুটব, প্রেম-সুধা পান করবার জন্য উধাও হয়ে ছুটব—তোমাকে

মা মা বলে ডাকতে ডাকতে ছুটব। বিশ্ববিপ্লবিনী, তোমার করুণা-সুধার কণা-পরিমাণ পান করে আমাদের পিপাসা মিটবে, হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হবে, প্রাণ শান্ত হবে, আমরা তখন সমস্ত জগৎময় তোমারি দেওয়া প্রেম-কণা বিতরণ করব— তখন আমাদের কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব, বাধাবিঘ্ন থাকবেনা। আমরা আপনা ভুলে পরের সেবা করব, আমরা জগৎপ্রেমে মাতোয়ারা হব। এক জগৎযোড়া প্রেম-সরোবরে বিশ্ব-প্রেমের মহাপদ্ম ফুটে উঠবে—সেই মহাপদ্মের উপর বিশ্ব-মাতৃকার রক্তচরণ শোভা পাবে। আর সমগ্র বিশ্বশুদ্ধ বিস্ময়ভরে তাঁহার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িবে।

এই কি বিশ্বমায়ের মূর্ত্তি

৫ই অগ্রহায়ণ—কই আমিত বিশ্বমায়ের অনুকম্পা পেলাম না! মাও আমাকে অভয় দিলেন না। আমি মার শান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি চেয়েছিলাম, আমি তাঁর নিকট অভয় আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেছিলাম, কিন্তু একি! তিনি আমাকে রুদ্রমূর্ত্তি দেখাচ্ছেন কেন? আমার প্রতি স্নেহ না দেখিয়ে বিভীষিকা দেখাচ্ছেন কেন? কি ভীষণ কি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি! এমন অশোভনা উন্মাদিনী সেজেছ কেন মা? অয়ি অনিন্দ্যবদনে, নানারত্নবিচিত্রভূষণে, তোমার এ পরম কুৎসিত রূপ, এ দিগম্বরী বেশ কেন? তুমি ইন্দু-কান্তি

না হয়ে আজ যে ঘোরা অমানিশি হয়েছ, তুমি চিরাবগুণ্ঠনা ছিলে, আজ অবগুণ্ঠন খুলে, স্বর্ণচেলি খুলে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে, চিরনগ্না হয়ে করোটি কপাল হাতে লয়ে, তপ্ত সুরা পান করছ —তুমি পিশাচী, ডাকিনী হয়েছ কেন মা! তুমি করুণাময়ী বিশ্বজননী ছিলে, আজ নরশোণিতলোলুপা, ভ্রূকুটি-কুটিলা, অতিবিস্তার বদনা, জিহ্বাললন-ভীষণা, নিমগ্নারক্তনয়না, স্বামি-পুত্র-সর্ব্বহারা, পরপীড়াব্রতা, সর্ব্বনাশী হয়েছ—শান্তি, প্রেম ও ক্ষমা ত্যাগ করে চির-অশান্তি, চিরক্রন্দন, চিরবিনাশকে বরণ করেছ—মুক্তাহার ত্যাগ করে তুমি নরমুণ্ডমালা পরেছ—তোমার লীলা পদ্ম, শঙ্খ, চক্র আজ কোথায়? তুমি যে আজ বিচিত্র-খট্টাঙ্গধরা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী হয়ে সন্তানকে সংহার করতে এসেছ! তোমার অভয়াশীর্ব্বাদ না শুনে আজ সন্তান যে তোমার অট্ট অট্ট হাসি শুনছে, বর চাহিতে গিয়ে তোমার হাতে কৃপাণ আর ছিন্নমুণ্ড দেখ্‌ছে! তোমার মুখে ঢল-ঢল প্রীতি না দেখে, ভীষণ ভ্রূকুটি দেখছে! কোথায় স্বর্ণসিংহাসনে উজ্জল স্বর্ণপ্রতিমা, কোথায় ধূপ-ধূনা পুষ্পগন্ধ, শঙ্খধ্বনি, কনক-প্রদীপের স্নিগ্ধজ্যোতি, আর কোথায় এই উন্মাদিনী, ভয়ঙ্করীর মহাশ্মশানে তাণ্ডব নৃত্য, মহাবহ্নির শত শত মুখে উল্কাপাত, ফেরুপালের চীৎকার ও পিশাচ পিশাচীর বিকট আর্ত্তনাদ!

করুণাময়ি, তুই সন্তানকে ছেড়ে গেলি! আমার হৃদয়ে আর প্রেম নাই, প্রাণে আর শান্তি নাই, তুই আমাকে ছেড়ে গেলি! তবে আমার জীবনের ব্রত নিষ্ফল। আমার নিজের হৃদয়

পাষাণ হলে আমি পরের সেবা করব কি প্রকারে? আমার কি ভীষণ পরিণাম! না আমি অধীর হব না, আমি করুণাময়ীকে ফের খুঁজব। আমার কাজকর্ম সমস্ত ছেড়ে তাঁকে খুঁজিব, তিনি যদি আমায় আবার তাঁর স্নেহকরুণায় অভিসিঞ্চিত করেন, তবে আবার নূতন প্রেমে নূতন বলে কর্ম্ম-জগতে ঝাঁপ দিব—নচেৎ এইখানেই জীবনের শেষ।

মা যেমন সন্তানের জন্য আত্মদান করে সুখী হয়, আমি আমার আত্মসৃষ্টিকে সেরূপ মাতৃভাবে সেবা করতে গিয়াছিলাম; কিন্তু বোধ হয় আমি মায়ের নিষ্কাম সেবাব্রত ভঙ্গ করেছি—মা যে আপনার ইচ্ছা দমন করে, আপনাকে সন্তানের ইচ্ছার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে—আমি বোধ হয় আমার স্ব-ইচ্ছাকে সেরূপ দমন করতে পারি নাই, কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার আমার মনে এনে আমার ইচ্ছাকেই প্রবল করেছি।

ভক্ত গাহিতেছে, "ইচ্ছাময়ি তারা, তোমার ইচ্ছায় সব হয়, কে জানে মা তোমার মহিমা। তুমি নিয়ে যাও যে পথে, আমি যাই মা সে পথে, করি সদা তব নিয়ম পালন।" কিন্তু মায়ের মহিমা তিনি যে ইচ্ছাময়ী, সেজন্য নহে। মা আমাদিগকে খেলিতে দিয়াছেন, সংসার-খেলনা দারা-সুত লয়ে খেলিতে দিয়াছেন। আমাদের যেমন ইচ্ছা আমরা সেরূপ খেলিতেছি। মা আপনার ইচ্ছা দিয়ে আমাদের খেলা নিয়ন্ত্রিত করেন নাই। এইখানেই মাতার ত্যাগধর্ম্ম, মাতৃত্বের সন্ন্যাস, মাতার মহিমা। জগতের সমস্ত পাপ গ্লানি মায়ের মহিমা

প্রকাশ করিতেছে। মা আপনার ইচ্ছা সম্পূর্ণ দমন করিয়া, তাঁহার পাপী অধম সন্তানকে, ডাকিনী, কুহকিনীর মন্ত্রে বশীভূত হইয়া, কুটিল কুপথে ভ্রান্ত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে দিয়াছেন। তিনি কুটিল কুপথ বোধ করিয়া দাঁড়ান নাই, দাঁড়ালে যে তাঁর সৃষ্টি রক্ষা হ'ত না, অবোধ-সন্তান যে খেলা না করিতে পারিয়া কাঁদিত। মার এই আত্মহারা-ভাবে, এই আত্মদানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ-মহিমা; আমার সেই আপনা-ভুলা ভাব আসে নাই। আমি আমার ইচ্ছাকে প্রবল রাখিয়াছি। আমি যাহার নিকট আত্মদান করব ভেবেছিলাম তাহাকে বুঝি আমার ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত করেছি, তাই মা আমার উপর রাগ করেছেন।

মনে হচ্ছে,—করুণাময়ী জননী আমার অহঙ্কার দূর করবার জন্য ঐ ভয়ঙ্করবেশে রণরঙ্গে আমার হৃদয়ে এসেছেন—চিতার আগুন জ্বালিয়ে আমার আমিত্বকে দগ্ধ ভস্মীভূত করিতে চাহিতেছেন, আমার নিজ ইচ্ছার সমূল বিনাশ করবার জন্য অমন সংহারিণী-মূর্ত্তি লইয়াছেন।

আমার মনকে আরও ভাল করে বুঝে দেখব আমি মায়ের নিষ্কাম সেবাব্রত কতদূর পালন করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এই কাজের গোলমালে এ আত্মচিন্তা অসম্ভব। আমি দিন কতক কাজ হইতে ছুটি লইয়া দেখি। বড় অশান্তি হয়েছে, ইহার একটা প্রতিবিধান এখনই করিতে হইবে। এখানে এই কাজের মধ্যে থেকে হবেনা, অন্য কোথায়ও যেতে হবে।

গৃহী ও সন্ন্যাসী

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন,—দেবিদাস, তোমাকে আজকাল বড় অন্যমনস্ক দেখছি, তোমার মনের অবস্থা ভাল ত? দেবিদাস কহিল,—না ভাল নয়, আমি সেই সম্বন্ধে একটা কথা জানাতে এসেছিলাম। মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—কি বল, রমেশ ত তোমার বন্ধু, ওর সামনে কথা হলে দোষ হবে না ত? দেবিদাস কহিল—না দোষ হবে কেন? ও থাকলেই ভাল। দেখুন মাষ্টার মহাশয়, আমি আজ কাল বড় অশান্তি ভোগ করছি, আগে কাজ করে যেতাম, কাজের মধ্যে ডুবে থাকতাম, নিজের মনকে দেখার অবসর থাকত না; কাজের মধ্যে আনন্দ পেতাম, তাতেই চরম শান্তি মনে হত। কিন্তু সে দিন যে রমেশের সঙ্গে আমাদের সকলের আলোচনা হ'ল, তার পর হ'তে আমি হৃদয়ের ভিতর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি। যত হৃদয়ের ভিতর ঢুকছি তত আমার মনে হচ্ছে আমি কত দুর্ব্বল, কত অসহায়! আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, আমার মনের ভিতর একটা অহঙ্কার সুপ্ত আছে। তাহা আমার সেবাব্রতকে একবারে নিস্ফল করে দিচ্ছে, আমি সেবা করতে গিয়ে নিজেরই প্রতিষ্ঠা করছি—আমার আমিত্ব দৈত্যটা আমার ঘাড়ে চেপে আমাকে মরীচিকার অন্বেষণে চালিয়েছে,

শেষে আমাকে তৃষ্ণার যন্ত্রণায় ছটফট করতে হয়েছে, তাই আমি সব কাজে আনন্দ পাই নাই, অনেক সময়ে দুঃখ নিরাশা আমার হৃদয়কে অন্ধকার করেছে, ব্যর্থতায় অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়েছি। অবিশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়েছি—বিশ্বাসের আলোককে স্তিমিত করেছি—আমি বুঝেছি আমার সেবা-অনুষ্ঠানটাকে খুব পাকা ভিত্তির উপর গড়তে পারি নাই, গোড়াপত্তনের ভিতর আমার আমিত্ব একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে—সে সুড়ঙ্গটাকে যে এখন দেখতে পেয়েছি ইহাই ভগবানের দয়া। আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় নিয়ে কয়েক মাসের জন্য অন্য-স্থানে যাব স্থির করেছি। সেখানে নির্জ্জনে আমার মনকে একটু সবল সুস্থির করতে চেষ্টা করব। আমার মন সবল না হলে আমার সব কাজ বৃথা, কাজের পর কাজ একটা বোঝা হ'য়ে আমার হৃদয়কে যেন ক্রমশঃ পঙ্গু করে ফেলছে। কাজে আমি আর আনন্দ পাচ্ছিনা—মনে হচ্ছে যেন কত কি জঞ্জাল ডেকে এনে আমি হৃদয়কে ভরে দিচ্ছি, আর আমার প্রাণটা যেন হাঁফিয়ে উঠছে।

দেবিদাসের এই নূতন অনুভূতিতে সকলের হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। রমেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল—তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একটু ধীরভাবে কয়েকদিন ভাবলেই শান্তি পাবে। দেবিদাস কহিল—তুমি বোধ হয় আমার মনকে ঠিক বুঝতে পারছনা, আমার মনের ভিতর এমন একটা অশান্তি এসেছে যে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিনা।

আমার জীবন, সত্যি বলছি, বড় দুর্ব্বল হয়ে উঠছে। যদি এই ভাবটা ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে, তখন আমার থাকা অসম্ভব হবে—আর যতদিন এ মানসিক যুদ্ধ চলবে ততদিন আমার পক্ষে অন্য কাজকর্ম্ম করা কঠিন। আর আমি এখন কিইবা করছি, তুমিত ভাই সব কাজই এখন হাতে নিয়েছ। রমেশ কিছু কহিল না, চক্ষু নত করিয়া বসিয়া রহিল—তাহার মুখের উপর একটা বিষাদের দাগ পড়িল! মাষ্টার মহাশয় স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন—কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে দেখ আবার উল্টা বিপত্তি না হয়। চিন্তার সঙ্গে কাজের যেন একটা যোগ থাকে—না হলে চিন্তা আলগা পেলে কোথায় যে মনকে নিয়ে যায় তা ঠিক নেই। হরিমোহন বাবু ভাবিয়াছিলেন, দেবিদাসের এ অনুভূতি স্থায়ী হইবে না। এক এক সময়ে হৃদয়ে অবসাদ আসে, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠে। ধীরচিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণের পর আবার মনের সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসে। তিনি আর এক কথা আনিলেন,—তোমার দাদা হৈমীর কয়েকটা সম্বন্ধ ঠিক করছিলেন, তা কি হল?

দেবিদাস বলিল—দাদা কলকাতায় চাকরী নিয়ে পর্য্যন্ত বাড়ী আসিতে পাচ্ছেন না, তাঁর একবারেই ছুটি নেই লিখেছেন, আমাকে চেষ্টা করতে বলেছেন। আপনি যে কয়েকটা সম্বন্ধ করছিলেন তার কি হ'ল? মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—আমি সম্বন্ধ একবারে ঠিকই করেছি—তোমার সম্মতি হলেই

এখন হয়। দেবিদাস ব্যস্ত হইয়া কহিল—আপনি স্থির করেছেন, এরই মধ্যে ? আমাকেত বলেন নি ? কার সঙ্গে ? মাষ্টার মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—এরই সঙ্গে। বলিয়া রমেশের দিকে তিনি চাহিলেন। দেবিদাস আশ্চর্য্য হইয়া অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—"রমেশ বিয়ে করবে ? তাই না কি ?" বলিয়া সে রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রমেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেবিদাস বুঝিল সে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছে। মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—হাঁ করবে; হৈমীর সঙ্গে বিয়ে খুব ভালই হ'বে—তোমার এতে আপত্তি নেই ? দেবিদাস কহিল—আপত্তি কেন হবে ? ভালইত। এর চেয়ে আর ভাল কি হ'তে পারে ? তাহার পর সোৎসাহে হাসিয়া বলিল—তা হ'লে বিয়ের দিন একটা ঠিক করে ফেলুন। কিছুদিন পরে রমেশের হৈমীর সহিত বিবাহ হইয়া গেল।

বিশ্বলক্ষ্মী

রমেশ যদিও অকুণ্ঠিত মনে হৈমবতীকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া লইয়াছিল, তথাপি তাহার হৃদয়ে যে একটা ভয়, নূতনের সহিত নূতন পরিচয়ের একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-মিশ্রিত আশঙ্কা প্রথম প্রথম জাগে নাই তাহা নহে। এই যে তরুণী

তাহার নারীত্বের পূর্ণগৌরবে তাহার অন্তরের প্রকাণ্ড প্রাসাদের মধ্যে রাণীর বেশে প্রবেশ করিল, তাহার পূর্ণ পরিচয় সে ইতি-পূর্ব্বে কখনও লয় নাই। আপনার উপর বিশ্বাসকেই সে সব চাইতে বড় করিয়া দেখিয়া পরকে অশঙ্কিত হৃদয়ে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে—তাহার কাছে তাহার নিজের উপর বিশ্বাসও যা, পরের উপর বিশ্বাসও তাহাই ছিল বলিয়াই এই বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে অনেকটা নিশ্চিন্তই ছিল। কিন্তু সত্য সত্যই যে দিন হৈমবতী পূর্ণরূপে রমেশের হইয়া তাহার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া অকথিত ভাষায় বলিল "আমি তোমার", সেই দিন সে যেন একটু ভয় পাইয়াছিল—সেই দিন যেন হঠাৎ তাহার মন বলিয়াছিল এই একেবারে আমার মানুষটীকে লইয়া আমি কি করিব, কোথায় রাখিব? কি ভাবে আপনাকে ইহার কাছে দিলে ইহার মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান দেখান হইবে? এই যাহাকে পাইলাম এতো আর কিছু নয়—এ সে আমারই মত একটা মানুষ। এতো ঘটি, বাটী, থাল, গেলাস নয় যে হাতে পাইলেই ইহাকে পূর্ণরূপে পাওয়া হইবে বা একবার মাত্র হস্তগ্রহণের স্পর্শদান করিলেই ইহাকে চরিতার্থতা দান করা হইবে! রমেশ তাই প্রথম প্রথম একটু যেন ভয় পাইয়াছিল। কি ভাবে ইহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিবে,তাহাই ভাবিতে তাহার দু একদিন সময় লাগিয়াছিল।

কিন্তু পরিচয় জিনিষটা তখনই ভয়ের কারণ হইয়া উঠে" যখন সেইটাকেই বড় করিয়া দেখা যায়। যখন পরের পরিচয়

লওয়া অপেক্ষা নিজের পরিচয় দান করাটাই প্রয়োজন হয়, তখন পরের পরিচয়—অপরিচয়ের দিকে মন দিবার দরকার হয় না। রমেশেরও তাহাই হইল। রমেশ এমন ভাবে তাহার সমস্ত ভাব, সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আদর্শ লইয়া আপনাকে হৈমবতীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, যাহাতে হৈমবতী বালিকা হইয়াও বুঝিল সে ধন্য হইয়াছে। রমেশও বুঝিল তাহার অন্তর যাহা এতদিন চাহিতেছিল তাহাই হইতেছে; সেও এই আপনাকে বিকশিত করিয়া, প্রকটিত করিয়া, অপরের মধ্যে আপনাকে পূর্ণভাবে অনুভব করিয়া নিজেও ধন্য হইতেছে।

দিনে দিনে একটা প্রাণপূর্ণ মানুষের সম্পূর্ণ নিকটে থাকিয়া তাহারই প্রাণের উত্তাপেই রমেশও যেন আপনার কাছে আপনি অধিক পরিমাণে স্ফুটতর হইয়া উঠিল। এবং সেই সঙ্গে আর একটী যে অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল তাহা দেখিয়া রমেশ বুঝিল যে হৈমবতীকে জানিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল আপনাকে তাহার নিকট প্রকাশিত করিয়াই হৈমবতীর পরিচয় লাভ তাহার পক্ষে সহজ হইয়াছে। তাহার মন আনন্দে বলিয়া উঠিল—এই যে পরিচয় পাইয়াছি! এই যে তোমাকে চিনিলাম। এই যে তুমিও তোমার পূর্ণ মহিমায় জগতের সমস্ত স্ত্রী, সমস্ত কোমলতা, সমস্ত স্নেহ প্রেম ও আনন্দ একীভূত করিয়া লক্ষ্মীরূপে আমার মধ্যে দিনে দিনে প্রকাশিত হইতেছ। এইত তোমায় পাওয়া—আবার কি

ভাবে পাইব? আমার যাহা কিছু ছিল তাহাই তোমায় দিয়া তোমায় যে ভাবে আমি চাহিয়াছিলাম—তুমি যে সেই ভাবকে কলায় কলায় পূর্ণ করিয়া আরও অধিক হইয়া আমার কাছে আসিলে! আমি ধন্য হইলাম—আমার মনের মাধুরী, হৃদয়ের বিস্তৃতি, চিত্তের কল্পনা, আত্মার আশাকে পূর্ণ করিয়া, অতিক্রম করিয়া, তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।

আমি পূর্ব্বে একলা ছিলাম। এখন আমি আমার সেবা-ব্রতের একজন সাথী পাইয়াছি। আমার পূর্ব্বে অহঙ্কার ছিল, আমি আমার সৃষ্টি লইয়া কত ভাঙ্গাগড়া করিতাম। আমার কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার ছিল তাই কর্ম্মে একটা নেশা, একটা উত্তেজনা ছিল। কত প্রকার কর্ম্ম খুঁজিয়া বেড়াইতাম, কয়েকদিন এক কর্ম্মে, কয়েকদিন আর এক কর্ম্মে তৃপ্তি পাইতাম। আবার কখনও শুধুই অতৃপ্তি—সব অন্ধকার নিরানন্দ! তুমিই সেই অন্ধকার, সেই নিরানন্দ দূর করিলে—তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী, আনন্দময়ী হ'য়ে আমায় আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করিলে—আমাকে জ্ঞান দিলে, আমার সেবাব্রতকে নিষ্কাম নির্ব্বিকার ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে। তুমি যে আমার কর্ম্মশরীর। তোমাকে পাইয়াছি আমি বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধি করিবার জন্য, নিষ্কাম কর্ম্মের ব্রত সাধনের শিক্ষালাভ করিবার জন্য। আমি এতদিন একলাই ছিলাম। তুমি আমাকে শত সহস্র লোকের মাঝে লইয়া গিয়াছ—তোমার একাগ্র প্রেমের অবাধ উচ্ছ্বাস আমাকে বিশ্বপ্রেমের সাধনা শিখায়েছে—বিশ্বপ্রেম তোমার

প্রেমের রূপ ধরে আমার কাছে আসিয়াছে, আমি বিশ্বপ্রেমের সাধনা করব বলে তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। হে আমার কর্ম্মশরীর—কর্ম্মানন্দময়ী, তুমি আমাকে বিশ্বপ্রেমের দিকে হাত ধরিয়া লইয়া চল। আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আমার প্রাণের সহিত প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের প্রেমের যোগ বুঝিতে পারিয়াছি, আমার হৃদয় এখন সকলকেই চায়। সকলেরই সহিত একটা প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উন্মুখ হইয়াছে। তাই আমার কর্ম্মের বিরাম নাই, আমি প্রত্যেক সৃষ্টজীবে তোমার ছায়া দেখিয়া অফুরন্ত ভালবাসা দিতেছি। তুমি এক মূর্ত্তিতে আমার নিকট আস নাই, তুমি যে অনন্ত মূর্ত্তি লইয়া বিশ্বে আমার প্রেম ভালবাসা লইয়া ফিরিতেছ। তোমাকে যেরূপ কত বিচিত্র ভূষণ, কত বর্ণ, কত গন্ধ দিয়া সাজাইয়াছি, হে আমার কর্ম্মশরীরময়ি আনন্দময়ি, আমি সেরূপ কত কল্পনা, কত সাধ-বাসনা দিয়ে আমারি সৃষ্ট কর্ম্মকে আরাধনা করেছি—তাহা কি তুমি দেখ নাই? আমার কর্ম্ম সে যে তোমারি প্রতিমা, তাই তাহাকেও যে আমি আমার মনের মাধুরী মিশাইয়া রচনা করিয়াছি। আমার কর্ম্মের সৌন্দর্য্য সে যে তোমারি মহিমা নূতন করে প্রচার করিবে। তবে এস হে লীলাময়ি, কর্ম্মাত্মিকা, এস আমার হৃদয়ে, তোমার সিঁথি'র সিন্দুর-রেখা আমার সমস্ত কর্ম্মের ভিতর একটা মঙ্গল-রেখা অঙ্কিত করুক—তোমার দক্ষিণ হস্তের শোভন শঙ্খ কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে একটা মঙ্গলের সুর বাজাইতে থাক, তোমার

অঙ্গের স্নিগ্ধ স্পর্শ কর্ম্মের সহস্র বেদনা যন্ত্রণাকে নিমেষে প্রশমন করুক, আমি যেন তোমার আনন্দময়ী মূর্ত্তি বিশ্বের সকল স্থানে, সকল কাজে দেখিতে পাই—তোমার স্থির অচঞ্চল নয়নের নীলিমা উর্দ্ধে নীলাকাশ বিস্তার করিয়া দিক, তোমার অঙ্গাভরণ ধরণীকে স্নিগ্ধ রৌদ্র-কিরণে উদ্ভাসিত করুক, তোমার কনক কঙ্কণে, নুপুর-শিঞ্জনে বিশ্বের সমস্ত সুর গীত মুখরিত হউক, তোমার কণ্ঠস্বরে বিশ্বের সকল লোকের সকল কথা প্রকাশিত হউক—তোমার এলায়িত কেশপাশ আষাঢ়ের নীলনবঘন রূপে শ্যামলা ধরণীর উপর স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করুক, তোমার নম্র ললাটের টিপ নির্জ্জন সাগরকূলে নীরব সন্ধ্যার শেষরশ্মি প্রতিফলিত করুক, তোমার সিঁথির শুভ-সিন্দুর-রেখা নির্জ্জন গিরিতটে নির্ম্মলা উষার প্রথম রশ্মি বর্ষণ করুক।

হে আমার কর্ম্মময়ি, আমার কর্ম্মানন্দ সে যে তোমারি সৌন্দর্য্য। নিখিল বিশ্বের সুখ দুঃখ, নিখিলের প্রেম, যে তোমার সুখদুঃখ, তোমার প্রেমের মত, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—তোমার প্রেমে বিশ্বপ্রেমের স্মৃতি মিশিয়াছে বলেই—হে আনন্দময়ি, আমি কর্ম্মে প্রকৃত তৃপ্তি পাইয়াছি। তোমার সুখে যেমন আমি সুখ পাই, এবং দুঃখে দুঃখ পাই, সেরূপ সকলের সুখে আমি হাসিতেছি, সকলের দুঃখে আমি কাঁদিতে শিখিয়াছি, শুধু তোমার নিকট প্রেমের শিক্ষালাভ করে। নিখিল সুখ দুঃখ মন্থন করে উঠ, অয়ি কর্ম্মময়ী, লীলাময়ী, ভুবনলক্ষ্মী, সেই নিখিল তরঙ্গিত অনন্ত কর্ম্মসাগর ত্যাগ করে, তোমার বাম

হস্তে নিখিল বিশ্বের বাসনারূপী লীলাকমল, তোমার দক্ষিণ হস্তে আনন্দরস-সুধার স্বর্ণ-পাত্র। এই বিশাল বিশ্বের অসীম বাসনা ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয় তাহার শোণিত দিয়া তোমার হস্তস্থিত ঐ লীলাকমলকে রক্তবর্ণ প্রদান করিয়াছে। পদ্মের একটি পর্ণের পর আর একটী পর্ণ সুসজ্জিত, সেরূপ বিশ্বের কত যে সাধ বাসনা একটি একটির পর জাগিয়া উঠিতেছে তাহার অন্ত নাই। আর তুমি সেই অন্তহীন বাসনাপুঞ্জ লইয়া আপনার কোমল অঙ্গুলীর সঞ্চালনে কত খেলা করিতেছ। এক একটি পর্ণকে ফুটাইয়া নিত্য নব সৃষ্টির দ্বারা নিত্য নূতন বাসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া তোমার অন্তহীন অসীম-বৈচিত্র্য-পূর্ণ লীলার মহিমা ভক্তকে বুঝাইয়া দাও। ঊর্দ্ধে অসীম আকাশ, নিম্নে অসীম সিন্ধু, মধ্যে অসীম স্থলের প্রতি কণা দুলিতেছে,—এই বিশাল বিশ্বের অণুপরমাণু যে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া অবিরাম ঘুরিতেছে, সেই আনন্দ-রস-ধারা তুমি বিশ্ব হইতে তোমার সুধাপাত্রে সঞ্চয় করিয়াছ—সেই আনন্দরসের এক বিন্দু তোমার পাত্র হইতে বিতরণ করে ভক্তকে তোমার লীলায় মুগ্ধ হইতে শিখাও। সে অমৃত পান করিয়া ভক্ত যেন আপনাকে এই অনন্ত কর্ম্মস্রোতে উল্লাসে আবেগে ভাসাইয়া দেয়। শুধু তোমার দিকে চাহিয়া, তোমার চক্ষের পলকবিহীন দৃষ্টি আত্মার নিকট কালকে চিরকালের জন্য বিলীন করিয়া, তোমার জীবন মৃত্যুর মত মৃণালভুজের সোহাগবেষ্টনে আত্মাকে জীবন মৃত্যুর বন্ধন হইতে চির মুক্তি দান করিয়া,

তোমার মোহন স্বরে বিশ্বের সকল আশা, আকাজ্ক্ষার কাহিনী শুনিয়া, তোমার রক্তিম কপোলে বিশ্বের সকল সাধবাসনাকে প্রতিফলিত দেখিয়া, তোমার দিব্য ললাটফলকে বিশ্বজনের অসীম অনন্তের আকাঙ্ক্ষা প্রতিবিম্বিত দেখিয়া, তোমার আত্মহারা প্রেম ভক্তকে আপনা ভুলাইয়া, যেন বিশ্বজনের প্রতি প্রেমে উন্মাদ করে; তোমার মোহিনী মূর্ত্তি নিখিল জীবের উপর ছায়াপাত করিয়া যেন ভক্তের অবিরাম প্রেম ভিক্ষা করে।

গৃহলক্ষ্মী

এদিকে আরও দুইজন প্রেমের সাধনার অধিকারী হইতেছিল। সিধু কারাগৃহ হইতে যতদিন ফিরে নাই, তত দিন সুধা সিধুর দোকান চালাইয়া আসিয়াছে এবং অবসর সময়ে হৈমীরও বাড়ীর কাজ করিয়াছে। সমস্ত দিনই তাহাকে দোকানে বসিয়া থাকিতে হইত। সংসারে সে একা, কিন্তু সিধুর কাজ নিজ হাতে করিতে করিতে সে আপনাকে একা মনে করিত না। নিতান্ত নিঃসহায় হইলেও সে তাহার প্রত্যেক কাজের মধ্যে সিধুর আদর স্পর্শ অনুভব করিত। সে তাহার সম্মুখে নাই, তবু তাহার কান্তরূপ সততই তাহার মনে জাগ্রত থাকিত। মাঝে মাঝে তাহার দুর্ব্বলতা আসিত, সমস্ত দিনের

কর্ম্ম তাহাকে মাঝে মাঝে কাতর করিত, সে মনে করিত সিধু আর আসিবে না। তাহার উদাসভাব তাহার দুর্ব্বল হৃদয়কে উদ্বেলিত করিত; কিন্তু সে পাষাণে মন বাঁধিতে শিক্ষা করিতেছিল। জীবনের উষায় সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে চিরকালের জন্ম ডুবিয়া যাওয়ায় সে যে চিরতমসাকে বরণ করিতেছে, তাহার জন্ম সে প্রস্তুত হইতেছিল। এরূপ মাসের পর মাস কাটিয়া গেল। তাহার জীবন একটা নীরব নিশীথের মত হইল। তবুও তাহার নবীন জীবনের প্রথম সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া নীরব নিশীথকে জ্যোৎস্নালোকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সেই জ্যোৎস্নায় আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার স্বপ্নের রাজ্য গড়িয়া তাহার স্বপ্নরাজকে সেবা করিতেছিল। সে তাহার স্বপ্নরাজকে লইয়া সন্তুষ্ট ছিল। এই সাধনার দ্বারাই সে সিধুকে সত্যভাবে লাভ করিল। সিধু যখন কারাগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল, তখন সুধা তাহাকে নূতন শ্রী ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত দেখিল,—সুধার নিকট সে পূর্ব্বে অমন মনের মানুষটা ত ছিল না, সুধার মন তাহাকে অমন করিয়া 'আমি তোমার' এ কথা বলে নাই।

* * * *

তাহার পর পরিণয়বদ্ধ সুধা ও সিধু সুধার পিত্রালয়কে নন্দনভূমিতে পরিণত করিল, সে কথা না বলিলেও চলে।

বিশ্বের পথে

হৈমীর বিবাহ হইয়া গেলে দেবিদাস নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল—'যাক্ বাঁচা গেল, এক দিকের কাজের শেষ হইল।' কিন্তু নিশ্বাস জিনিষটা ফেলিতেও যতক্ষণ টানিতেও ততক্ষণ। কাজ জিনিষটাও তেমনি শেষ করিতেও যতক্ষণ জুটিতেও ততক্ষণ। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ জীব এই শেষ করা আর আরম্ভ করা, ছাড়িয়া দেওয়া আর টানিয়া লওয়া, এই উভয় কার্য্যের টানা ভরণা করিতে করিতেই জীবনের পথে অগ্রসর হয়। ঠিক যে দিন মনে করিলাম, থাক্ আজ শেষ হইল;—ঠিক সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই চাহিয়া দেখি আবার কাজ আসিয়া জুটিয়াছে, আবার নূতন চিন্তারাশি ঘনাইয়া আসিয়া আমাকে ঘিরিয়াছে, আবার নূতন ভাবস্রোত চলিতেছে 'আগে চল, "আগে চল'; যাহা শেষ হইতেছে তাহার শেষের মধ্যেই যে নবতর আরম্ভের সূত্রপাত লুকাইয়া থাকে এ কথার সংবাদ কেহ পূর্ব্ব হইতে রাখে না। তাই কাজের সময় শেষের দিকেই মানুষের দৃষ্টি থাকে।

সন্ধ্যার পর দেবিদাস তাহার ছাদের উপর পাটী বিছাইয়া শুইয়াছিল। বড়দিনের ছুটিতে কিছুদিন থাকিয়া তাহার দাদা পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। নিম্নতল হইতে তাহার দিদি ও ভ্রাতৃজায়ার কথাবার্ত্তার মৃদুধ্বনি আসিতেছিল।

দূরের আখড়া হইতে সংকীর্ত্তনের শব্দ মাঝে মাঝে শুনা যাইতে-ছিল। সমস্তই শান্ত, সমস্তই মধুর। দেবিদাস শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছে "এই বার ছুটি!" এই সন্ধ্যার মত সমস্ত জীবনব্যাপী একটা ছুটি যদি সে পায় ত কেমন হয়? ভাল হয় কি?

তাহার দাদা কলিকাতায় সেই সদাগরী আফিসেই চাকরী করিতেছেন। সংসারও এখন অনেকটা সচ্ছল। এখন এই অবস্থায় তাহার সমস্ত দেহ মন ভরিয়া শান্তির মধুর বাঁশী বাজিয়া উঠুক না কেন? সব কোলাহল সমস্ত চেষ্টা থামাইয়া দিয়া সে এই সংসারের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসুক না কেন? এই ত রমেশ তাহার বড় বড় কথা, বড় বড় চিন্তাব্যাপী আশাকে ছোট একটা বাড়ীর চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। দেবিদাস কি তাহা পারে না? সেও কি প্রিয় বন্ধুর মত কাহাকেও আশ্রয় করিয়া একটী শান্ত সংযত জীবন আরম্ভ করিতে পারে না?

দেবিদাসের চিন্তা হঠাৎ এমন একটা স্থানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে তাহার মন ফিরিতে চাহিল না, অথচ না ফিরিলেও নয়। কারণ এই শান্ত সন্ধ্যার মাধুর্য্যের মধ্যে এমন মূর্ত্তি দেবিদাসের সুপ্তযৌবনাকাশের মধ্যে সহসা প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল যাহাকে কোন উপায়েই আর ঠেকাইয়া রাখিবার জো রহিল না। হাত দিয়া ঢাকিয়া কি আকাশের চন্দ্রের জ্যোৎস্না রোধ করা যায়? তাহাতে কেবল নিজের চোখের উপরকার আলোটুকু বদ্ধ হয় মাত্র—বাহিরের

সমস্ত বিশ্বই যে সেই আলোকে হাসিতেছে! সে হাসি কে রোধ করিবে? কে প্রাণের মধ্যে সেই হাসির প্রবেশ পথ রোধ করিবে? দেবিদাস শিহরিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

এমন সময় কে ডাকিল "ছোট দা!" দেবিদাসের বোধ হইল যেন এই সন্ধ্যার শান্ত আকাশের মধ্যস্থল হইতে স্নেহপূর্ণ স্বরে স্নেহময়ী ভগ্নীর স্বরে সংসার ডাকিল "ছোট দা!" সে যে এই সংসারেরই একজন, সে যে নিতান্তই আপনার জন; সেই জন্য সংসার তাহাকে ডাকিতেছে। হৈমী তাহার স্বামিগৃহ হইতে ফিরিয়া তাহার ভ্রাতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল "ছোট দা।" দেবিদাস ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কি রে হৈমী?" "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।" "আমার সঙ্গে? কি কথা?" "আমি দিদিকেও বলিছি, দিদিও স্বীকার করেছেন।" "কথা-টাই কি আগে বল?" "মনুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'ক।" দেবিদাস চমকিত হইয়া বলিল, "থাম থাম, জ্যাঠামী করতে হবে না।" হৈমী রাগিয়া বলিল, "জ্যাঠামী কি? তুমি কি বিয়ে করবে না নাকি? বৌদিদি বলছিল, তুমি না কি বলেছ বিয়ে করবে না?" "বৌদিদি বুঝি তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়া-চ্ছেন? বেশ লোক ত?" এমন সময় হরিদাসের স্ত্রী সেই সভায় আসিয়া যোগ দিল। দেবিদাস তখন বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "একটা গোলমাল থামতে না থামতে তোমরা আবার গোলমাল পাকাতে চাও?

ছদিন জিরোও, তারপর যাহা হয় করা যাবে।” হৈমী হাসিয়া বলিল, “তুমি যতই চালাকি কর আমরা আর তোমার কথা শুনছি না। বৌদিদি, তুমি ভাই. দাদার কাছে চিঠি দিও, আমিও দেব; দিদির যখন মত হয়েছে তখন দাদাও অমত করবেন না।” দেবিদাস শুইয়া পড়িয়া বলিল, “হৈমী, ওসব গোল পাকাসনে, আমি ছদিন ঠাণ্ডা হয়ে বসি, তার পর যদি ইচ্ছা হয়”—হরিদাসের স্ত্রী। ঠাকুর পো, ওসব কেউ শুনবে না। তোমার ইচ্ছের ওপর কি এ সব নির্ভর করবে? এই সব কাজে আমরা যা করব তাই হবে। দেবিদাস। অর্থাৎ ‘যার বিয়ে তার খোঁজ নাই পাড়াপড়শির ঘুম নেই,’ তোমরা তাই করবে? হৈমী রাগিয়া বলিল “চল বৌদিদি, ওর সঙ্গে কথায় কে পারবে? আমরা যা হয় করব—ওর কথা শুনবই না।” হৈমী ও তাহার ভ্রাতৃজায় নামিয়া গেল। কিন্তু তাহারা যে তরঙ্গ দেবিদাসের জীবনের স্রোতের মধ্যে তুলিল তাহা কিছুতেই থামিতে চাহিল না। ক্রমশঃ সেই তরঙ্গ উত্তাল হইয়া দেবিদাসকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। পরদিন প্রভাতে দেবিদাস হরিমোহন বাবুর নিকটে বসিয়া তাহার নিজের ভবিষ্যৎ বিষয় আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় রমেশ প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। হরিমোহন বাবু হাসিয়া বলিলেন, “রমেশ, এখন দেবিদাসকে সামলাও।” রমেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, “কি হয়েছে?” হরিমোহন

বলিলেন, "ও বলে যে আর এ সব ভাল লাগছে না। হৈমীর বিয়ে হয়ে গেল, এখন সে যাবেই স্থির করেছে।" "কোথায় যাবে?" "তা ওকেই জিজ্ঞাসা কর। ও বলছে যে সংসারের এ সব ভাল লাগছে না, মহা অশান্তি হয়েছে; সংসারকে কি ভাবে যে ওর দেখা হ'ল তাত বুঝতে পারছি না।" "আমি যে ভাবে প্রথম প্রথম দেখেছিলাম ক্রমশঃ তার সমস্তই উল্টে পাল্টে গেল। শেষে আরম্ভ করিছি। জানি না এ হতে কতখানি শিক্ষা আমি লাভ করব, কিন্তু এ টুকু ভরসা আছে যে ভগবান্ এই দিকে যে আমায় নিয়ে এসে ফেল্লেন তাতে আমার ভালই হবে, আমি নিশ্চয়ই এ হ'তে কিছু পাব যাতে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু সে কথা যাক, দেবিদাস এখন কি করতে চাও?" "তুমি কি করতে বল?" "আমি বলি আর এ রকম স্রোতের উপর পানার মত ভেসে বেড়ানর দরকার নেই। জীবনটা আর লঘু রাখা ঠিক নহে। এখন সংসারের ভেতর শিকড় বিস্তার করবার সময় হয়েছে। সংসারের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়, মুখামুখী পরিচয় তখনই হতে পারে যখন তার সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত বিপদ সম্পদ সমেত তার সব দায়িত্বটা ঘাড়ে নিতে পারব। যখন আমার মন সংসারের মধ্যে তার অনুভবের শিকড়টা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করেছে জানব, তখনি বুঝব যে আমিও বড় হয়ে উঠেছি—আমার আসল মানুষটার দেহটাও মস্ত গাছের মত আকাশের দিকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়িয়েছে।

তখনি বুঝব স্বর্গের হাওয়ায় আমার প্রকাণ্ড অস্তিত্বের প্রত্যেক শাখা প্রশাখা কাঁপছে; আর তখনি জানতে পারব দূর সপ্তর্ষিলোক হ'তে যে আলো আসছে তার অনেকখানিই আমি শাখা-প্রশাখা আর অসংখ্য পাতা দিয়ে নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছি।"

রমেশ নীরব হইলে, হরিমোহন বাবু সস্নেহে শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমার শিক্ষা ঠিক পথেই যাচ্ছে রমেশ; সংসারকে আপনার বিস্তৃতির ক্ষেত্রে দেখাই আমাদের চির-দিনের আদর্শ। কিন্তু ও কথা থাক, দেবিদাস যা বলতে চায় তার বিষয় কি বলতে চাও? ওর মনের ভাবটা এই যে, সবাইকে এ সংসারের ধুলোমাটী ঘাঁটতে হবে, তার কোন মানে নাই, কেউ বা উঠান ঝাঁট দিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে ময়লা ফেলে দেবে, কেউবা দূর নদী হতে নির্ম্মল জল এনে সেই মাটীতে ঢেলে তাকে পরিষ্কার করবে। দেবিদাস বলছে যে ও বাহিরের সেই নির্ম্মল জলের সন্ধানে যাবে।" "ওর যদি তাই ইচ্ছে হয়ে থাকে তা'হলে আমার মতে বোধ হয় ভুল করছে। সংসারের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না নিয়ে বাইরে গেলে আমার মতে স্বার্থপরের কাজ হবে।" "দেবিদাস উত্তর করিল—আমি সেবা ব্রতই নিতে চাই কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের যে অহংকার ক্রমাগতই আমার মধ্যে জেগে উঠে—তাকে দমন করে ঈশ্বরই যে আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছেন তাও বুঝতে চাই। আমি যখনই কিছু করি তখনি নিজের ভাল মন্দ কাজটাকেই বড় করে দেখি;

অন্তেও যে সে কাজটাকে অন্তভাবে দেখতে পারে, তাদেরও যে ভালমন্দ লাগার একটা দিক্ আছে, তারাও যে ঈশ্বর চালিত হয়ে কাজ করছে, এটা যে কিছুতেই মন বুঝতে চায় না। আমার এই অহঙ্কারের চাপ ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠেছে; তাই এটাকে না দমন করলে আমার পূর্ণভাবে সেবাব্রত গ্রহণ হবে না। সংসারকে ভালবাসতে চাই; কিন্তু তাকে আপনার মনের মত না হতে দেখলেই আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে—এই বিদ্রোহ দমন করতে হবে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য নির্জ্জন সাধনা চাই, একেবারে আপনাকে ঈশ্বরের হাতে ফেলে না দিলে কিছুতেই এ হবে না। তাই একবার সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে আহার বিহার ভাবনা চিন্তা সমস্তই নারায়ণের হাতে ফেলে দিয়ে দেখতে চাই।" রমেশ্ ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া দেবিদাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিল "তা হবে না দেবী,—তোমার এ খেয়াল বিসর্জ্জন দিতে হবে। এই গুরুর কাছে থেকে এতদিন যা শিখলে, সেই আদর্শটা যদি তোমার মনে এতদিনে গভীরভাবে অঙ্কিত না হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীর অপরপ্রান্তে গেলেও তুমি যে তিমিরে আছ সেই তিমিরেই থাকবে। গুরুদেব, আপনাকে আমার কড়যোড়ে নিবেদন আপনি আমার এই উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুটিকে সংসারে বেঁধে দিন।" "কি উপায়ে?" 'অনেক দিন হতে আমরা যে আশা পোষণ করছি সেইটে সফল করে দেন, দেবিদাসের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ দেন।" দেবিদাস ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল,

"থাম, থাম, রমেশ।" রমেশ থামিল না; বলিল, "দেবীর আত্মীয়স্বজন সকলেরই এই ইচ্ছা। আশা করি, আপনি নিরাশ করবেন না।" হরিমোহন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'তা আর যে হবে বলে বোধ হচ্ছেনা—দেবির মনের ভাব যখন এই রকম তখন কি করে আর তা হবে? সত্যকথা বলতে কি, আমিও অনেক দিন হতে এই আশা পোষণ করে আসছি—অনেকদিন হতেই মনে করে আছি যে মন্টুকে দেবিদাসের হাতে সমর্পণ করে শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাব। কিন্তু দেবীর মন যখন এদিকে নাই, তখন নিজের স্বার্থের জন্য ওর গতিপথে বাধা জন্মাতে পারব না।" দেবিদাস ব্যস্ত হইয়া করযোড়ে বলিল, "আপনি আমার চিরদিনের গুরু। আপনাকে ক্ষুব্ধ করে যদি আমি কোন কাজ করি তাহলে সে দুঃখ আমার মরণাধিক হবে। গুরুদেব, আমাকে দুদিন সময় দেন।"

রমেশ। না তোমায় একদিনও সময় দেওয়া হতে পারেনা। তোমার স্বজনদের আশা, তোমার বন্ধুদের ইচ্ছা, সকলের উপর গুরুর ইচ্ছাটাই সব চাইতে বড় করে যদি দেখতে না পার—"

হরি। থাম রমেশ। দেবি, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাজ কিছুতেই হবে না। তুমি নিশ্চিন্তমনে চিন্তা করে যা হয় বল। আমি এতদিন যদি অপেক্ষা করে থাকি তা হ'লে আর দুই চারদিনে কিছু যাবে আসবেনা।

দেবিদাস ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু গুরুর ইচ্ছাটা

তাহাকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। সে কিছুতেই থামিতে পারিল না। সে চেষ্টা করিয়া যতই সে কথা ভুলিয়া নিজের মনের ভাবটাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই যেন সজোরে তাহার কর্ণে বাজিতে লাগিল "আমার ইচ্ছা, আমিই চাহিতেছি।" শুধু কি গুরুদেবই চাহিতেছেন? দেবিদাসের অন্তরের মধ্যে যে বুভুক্ষিত মনের হৃদয়টা জাগিয়া উঠিয়াছে সেও কি আজ বহুদিন হইতে ইহাই চাহিতেছে না? মনোরমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহার চিত্ত যে একটা অপূর্ব্ব স্বপ্নজাল তাহার আপনার অজ্ঞাতে বুনিয়াছিল তাহা কি সময় অসময় দেবিদাসের মনটাকে মাঝে মাঝে সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলিয়া উদাসভাবে বসাইয়া রাখিত না? রাখিত, কিন্তু সেই মাতালকরা সুরাকেই যে তাহার বেশী ভয় হইয়াছে। ইহাকেই যে সে আজকাল কর্ম্মপথের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেছে। মনোরমার নারীত্বের শক্তির বিকাশ যে দিন তাহার মনকে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দেবিদাসের চিত্ত ক্রমাগত আপনার উপর চক্ষু রাখিয়া সময় অসময়ে আপনাকে চোখ রাঙ্গাইয়া কর্ম্মপথে খাড়া করিয়া রাখিত। কিন্তু তবুও অসতর্ক অবস্থায় কখন সেই গভীর-স্নেহ-পূর্ণ নারীনয়নের নীরব-শক্তি তাহার গোপনচিত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে মোহজালে আবৃত করিত, তাহার ঠিক ছিল না। তাই আজিকার এই কথায় এই সম্পূর্ণভাবে মনোরমাকে

হাতের কাছে পাইয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এখন সে কি করিবে? ইহাকে কোথায় রাখিবে? সে পাইয়াছে, বা একটীবার মাত্র একটী কথা বলিলেই এই শক্তিময়ীর সমস্ত শক্তি তাহারই জীবনের মধ্যে একমাত্র তাহারই হইয়া ধরা দিতে পারে—পূর্ণভাবে তাহারই কার্য্যে লাগিতে পারে। কিন্তু তথাপি দেবিদাস তাহাকে ডাকিয়া তাহার অন্তর্গৃহে বরণ করিয়া লইতে ইচ্ছা করিতেছে না কেন? দেবিদাস সমস্তদিন ধরিয়া এই কথাই ভাবিল। কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। শেষে রাত্রে নিদ্রার আশ্রয় লইতে গেল, তথাপি কোন উত্তর পাইল না। তখন সেই গভীর নিশায় বাহিরে ছাদে গিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, কেবল দূর পূর্ব্বাকাশে কৃষ্ণা নবমীর চন্দ্রোদয়ের আভাস! দেবিদাস চতুর্দ্দিকে চাহিল। আকাশ দেখিল—দূর অন্ধকার বনের মাথায় জোনাকির আলোকের তালে তালে জ্বলন নির্ব্বাণ দেখিল, নিস্তব্ধ রাত্রের সমস্ত শান্তিটুকু হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু কোথায় শান্তি? তাহার মনের যুদ্ধ এই নিস্তব্ধ চরাচরকে অপূর্ব্ব শব্দে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। যেন দূর দূরান্ত হইতে সহস্রকণ্ঠে কাহারা ডাকিতেছে—"আয় ওরে আয়। আপনাকে ভুলে—সব লাভ ক্ষতি ভুলে, শুধু আমাদের জন্য চলে আয়।" দেবিদাস তখন সজোরে বলিল, "যাব—নিশ্চয় যাব। কোন বাধা মানব না—বাহিরের বাধা অন্তরের বাধা কিছুই মানব না। নিজেকে ভুলব, আমার সুখদুঃখ আমার লাভক্ষতি সব চাইতে বড় নয়।"

দেবিদাস আকাশ হইতে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বদিকে চাহিল, দেখিল, উদীয়মান চন্দ্রের আলো ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। দেবিদাসের মন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "জীবনে নব চন্দ্রোদয় হইতেছে—আর ভয় নাই। ঐ দূরের আলোর জন্যই আমি বাহির হইব, আর আমি ঘরের অন্ধকার-কোণে আবদ্ধ থাকিব না—আমি যাব—যাব"—হঠাৎ মনে হইল কে যেন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "দেবি দাদা!" "কেরে তুই? কে ডাকছিস্?" কেহ না—দেবিদাস চকিতে ফিরিয়া কক্ষের দিকে চাহিল। তাহার অন্ধকারকক্ষ হইতে কে যেন অতি করুণ, অতি সস্নেহস্বরে ডাকিয়াছে! কে তুই?—দেবী কক্ষের দ্বারে যাইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল। কেহই নাই। সব দ্বার তেমনি বন্ধ—কেবল ছাদের দ্বারটাই খোলা! কে তবে তুই?

দেবিদাস বুঝিল এ তাহার মনের মধ্যে যেখানে সংসার তাহার স্নেহ মমতা আদর অভিমান লইয়া বসিয়া আছে—তাহারই আহ্বান। দেবিদাস কাতর হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। তারপর আকাশের দিকে চাহিয়া অন্ধকার দিগন্তের দিকে কান পাতিয়া শুনিল সেই কোলাহল, সেই 'আয় আয় আয়রে' শব্দ স্ফুটতর হইয়াছে। দেবিদাস মন স্থির করিয়া ফেলিল—বলিল, "যাব যাব বৈকি। ক্রমাগত আমি আর শুনিতে পারিব না। একবার তুমি আর তোমার সহস্র সহস্র জনকে অনুভব করে আমার এই আমিটাকে তোমার মধ্যে ডুবিয়ে দেব।"

দেবিদাস নিশ্চিন্ত মনে ভক্তিভরে সহস্রের মধ্যে যিনি এক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন তাঁহার কাছে তাহার আবাল্যের গুরুর আদেশ, ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহাকর্ষণ, বন্ধুর সৌহার্দ্দ্য—সমস্তই একাকার হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ের মধ্যে তাহার মানবহৃদয়ের ক্রন্দন থামিয়া গিয়াছে। শুধু জাগিয়াছে এক অনির্ব্বাণ জলন্ত আকাঙ্ক্ষা—সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়া পূর্ণ মুক্তির আশা, বিশ্বের আকুল আকর্ষণের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া। তখন তাহার কর্ণে জাগিতেছে একটি শব্দ—চল—চল—চল।

মায়ের অনুসন্ধান

দেবিদাস কয়েক মাস হইল তাহার কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। কেহই জানে নাই, সে কেন তাহা করিল। আপনার ঘরে থাকিয়া পূজা অর্চ্চনায় কালক্ষেপ করে। বাটীতে তাহার নিকট কেহ গেলে লোকে তাহাকে একটু অন্যমনস্ক, নির্লিপ্ত দেখে। লোকে দেখিতেছে সে লোকজনের সঙ্গে অধিক মেশামেশি করে না। মাসের পর মাস কাটিয়া গেল। সকলে ভাবিল দেবিদাসের আর সে উৎসাহ ফিরিবে না। দেবিদাস তাহার কর্ম্ম হইতে অবসর লইলে প্রথমে যাহারা বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন হইয়াছিল তাহারা রমেশকে তাহাদের বন্ধু

ও আশ্রয়রূপে পাইল। রমেশ গ্রামবাসিগণের একাধারে বন্ধু সহায় শিক্ষক সবই হইল। লোকেরা দেবিদাসের আশা ছাড়িয়া দিয়া ক্রমশঃ তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহার নাম উঠিলে তাহাদের কৃতজ্ঞ হৃদয় হইতে যে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইত, তাহাও রোধ করিতে চেষ্টা করিল। গ্রামবাসিগণের মধ্যে একজন দেবিদাসের কথা তবুও প্রায়ই ভাবিত। গুরুচরণ মনে করিত ব্রাহ্মণ তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছে সে যে ছেলেটিকে এতকাল ধরিয়া খুঁজিতেছে তাহাকে আনিয়া দিবেই, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা কখন নিষ্ফল হইবে না।

ছেলেকে পাওয়া যাইবে, গুরুচরণের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। দেবিদাস ছেলেটিকে অনুসন্ধান করিতে যত্নের ত্রুটি করে নাই, কাজের গোলমালে দেবিদাস যে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা খুব কমই স্মরণ করিয়াছিল, তাহা সে ধারণা করিতে পারে নাই। দেবিদাস কাজ হইতে ছুটি লওয়াতে সে একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। ছেলেকে এখন কে অনুসন্ধান করিতেছে? অনুসন্ধান চলিতেছিল। গুরুচরণ একদিন সকাল বেলায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পাড়ার কতকগুলি বালকবালিকার সহিত গল্প করিতেছে, হাসিতেছে, গান করিতেছে, এমন সময় একজন বৈষ্ণবী জয় রাধে বলিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া সম্মুখে আসিল এবং একটা গান আরম্ভ করিয়া দিল। ছোট ছেলেরা একটু আমোদ অনুভব করিল। বৈষ্ণবী উঠানে বসিয়া তিনটি গান

গাহিল। একটী ছেলে তাহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য ভিতর হইতে এক মুঠা চাল আনিতে গেল।

গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিল—তোমাদের বাড়ী কোথায়? বৈষ্ণবী কহিল—আমাদের আবার বাড়ী? আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভিক্ষা করে খাই। গুরুচরণ কহিল—তবুও কোথায়? বাড়ী নাই, কোথায় জন্মেছিলে? বৈষ্ণবী কিছুক্ষণ হাসিয়া কহিল—এই গ্রামেই আমি থাকতাম। কহিয়া মাথা নীচু করিল। তাহার মুখের উপর একটা গাম্ভীর্য্যের ছায়া বুলাইয়া গেল। গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিল—এই গ্রামে ছিলে, কোথায় ছিলে? বৈষ্ণবী কহিল—ছিলাম এই খানেই, সে আর জেনে কি করবে? গুরুচরণ স্থিরনেত্রে বৈষ্ণবীর দিকে চাহিয়া রহিল। বৈষ্ণবী তাহার সরল প্রসন্ন মুখ দেখিয়া, তাহার একটু অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করিয়া, বিস্মিত হইল। ইতিমধ্যে সে এক মুঠা চাল ভিক্ষা পাইয়াছে। সে চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু কি মনে করিয়া দাঁড়াইল। তখন ছেলেরা বৈষ্ণবীর গান ও গুরুচরণের গল্প ছাড়িয়া সম্মুখের মাঠে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, এ গ্রামের নায়েব মারা গিয়াছে শুনলাম, কবে মারা গেল? গুরুচরণ কহিল—সেত কয়েক বৎসর হয়ে গেল,—কেন? বৈষ্ণবী কহিল—নায়েবের বাটীতে একটী কায়স্থের মেয়ে ছিল, সে কি এখনও আছে? গুরুচরণ কহিল—হাঁ আছে বৈ কি। কেন? বৈষ্ণবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার প্রশ্ন

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—রমণ ঘোষের সেই পালিত ছেলেটা বেঁচে আছে ত?

গুরুচরণ কহিল—রমণ ঘোষের পালিত ছেলে? সে কে? আমাদের সিধুই ত তার একমাত্র ছেলে জানি। তুমি কি তার কথা জিজ্ঞেস করছ? বৈষ্ণবী কোন কথা বলিতে পারিল না, নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। গুরুচরণ বলিল, "কি গো, কথা কইছ না যে?" বৈষ্ণবী তাহার খঞ্জনী জোড়াটা ঝুলির মধ্যে রাখিয়া দিয়া অন্যদিকে চাহিল। তারপর বলিল, "থাক, আজ তবে আসি।" এই বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই গুরুচরণ বলিল, "কি একটা কথা যেন তুমি বললে না।" বৈষ্ণবী তাহার মুখের দিকে একটু চিন্তিতভাবে চাহিল, বলিল, "কথাটা তোমাকেই বলতে হল। ভেবেছিলাম বলব, কিন্তু কাকে বলে সন্ধান নেব, তা ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না; বয়েস ঢের হয়ে এল, এখন লুকালে নরকেও স্থান হবে না।" তাহার পর সে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "রমণ ঘোষের ঐ ছেলেটাই তার পালিত ছেলে।" গুরুচরণ বিস্মিতভাবে কহিল—"অ্যাঁ, সিধু পালিত ছেলে! কেউ ত জানে না।" বৈষ্ণবী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কেউ জানে না কেন? তাহার পর থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিল,—তার মা জানে যে আমি টাকার লোভে সেই নায়েবের মন্দ অভিপ্রায় শুনে তার ছেলেকেই নিয়ে পালিয়ে গেছিলাম, তার মা যে তাকে দেখলেই চিনবে—তার মা যে আমাকে কিছুতেই ক্ষমা

করবে না। নায়েবের বাটীতে আমি তার ঘরের ঝি ছিলাম, আমি টাকা খাইয়া এই কাজ করেছিলাম। আর জানে একজন—হা ভগবান্, আমার এ পাপ রাখবার যে ঠাঁই নাই—আমি তার কোলের ছেলেকে কত বকেছি, কত মেরেছি, কতদিন না খাইয়ে রেখিছি, শেষে পাপ গলগ্রহ মনে করে রমণ ঘোষের বউর কাছে বিক্রী করলাম। তার ছেলে ছিল না, আমাকে সে বার বার বলতে লাগল, আহা বেশ ছেলেটি ত! সে ছেলেটাকে দেখে এমন করলে আমি বুঝলাম ছেলেটা পেলে সে স্বর্গ পায়—আমি ছেলেটা তাকে দিলাম—নিজেও বাঁচলাম। গুরুচরণ বিস্মিত হইয়া জোরের সহিত কহিল—সেই কায়স্থের মেয়েটির ছেলেই সিধু! বৈষ্ণবী কহিল—হাঁ, আমি তার মার মনে, তাকেও যে কত কষ্ট দিয়েছিলাম, তা মনে করলে এখন বুক ফেটে যায়—কত বছর আমি এ গ্রাম ছেড়েছি, কিন্তু সে কথা ভুলিতে পারি নাই, এখন তা মনে করলে আর থাকতে পারিনা। কত দূর হতে ছুটে এলাম—আমি মহাপাতকী, আমার গতি হবেনা।

গুরুচরণ তখন ভাবিতেছিল, এই সিধুই না নায়েবকে খুন করেছে বলে এজাহার দিয়েছিল। ঠিক কথা। কানু আমার কংশারি। মা দেবকী, আর তোর ভাবনা নেই, সত্যই তোর হারানিধিকে আজ খুঁজে পাওয়া গেছে। ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ ও উৎসাহে তাহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বৈষ্ণবীর দিকে সহসা ফিরিয়া চাহিয়া কহিল,

তুমি আমার সঙ্গে এখনই সিধুর কাছে চল, ওদের বাড়ী কাছেই—এখনি পৌছাব। দুইজনে সিধুর নিকট চলিল, গুরুচরণ আপনার ভাবে মত্ত, কোন দিকে সে দৃক্‌পাত না করিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। বৈষ্ণবী খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে তখন একটা গান গাহিতেছিল।

আমার গতি কি হবে ?
পাতকী বলিয়ে ত্যজিয়ে যাবে !
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ,
কোথা শান্তিদাতা দাও শান্তিদান,
আর এ যাতনা সহেনা সহেনা
অনাথশরণ হে !

যখন তাহারা সিধুর ঘরে পৌছিল তখন বৈষ্ণবী শেষপদ ধরিয়াছে—

দাওহে দাও তোমার বিচারে যা হয়
খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়
তোমা হতে মলে এ ঘোর পাতকী
নবজীবন পাবে ॥

এই কি মায়ের মূর্ত্তি

গুরুচরণ ভাবিল সিধুকে একবারে সব কথা এখনি বলিয়া ফেলা উচিত হইবে না। তার মা মৃত নহে, এখনও জীবিত। যাহার নিকট সে প্রতিপালিত, যাহাকে মা মনে করিয়া সে চিরকালই তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদান করিয়া আসিয়াছে সে তাহার মা নহে, এসব কথা এখন তাহাকে বলিলে সে ত অবিশ্বাস করিবেই। প্রথম একবার অবিশ্বাস জন্মিলে, আবার বিশ্বাস হওয়া কঠিন। তার প্রকৃত মা তাহাকে চিনিয়া যদি তাহাকে বুকে তুলিয়া লয় তাহা হইলে সন্দেহ না হওয়াই অসম্ভব। গুরুচরণ স্থির করিল, মা-ই আপনার ছেলেকে আপনার ক্রোড়ে ডাকিয়া লউক, সে ত মার ভৃত্য, মার নিকটে ছেলেকে কোন রকমে পৌঁছাইয়া দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য।

গুরুচরণ সিধুকে ডাকিয়া কহিল—তুই আমার সঙ্গে একবার চল্ ত, খুব কাজ আছে, এখনি যেতে হবে। সিধু তাহার ব্যস্তভাব দেখিয়া তখনি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বৈষ্ণবীর পরিচয় জানিতে চাহিয়া সে গুরুচরণের নিকট কোন উত্তর পাইল না। তাহারা সকলে চলিল।

সিধু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তাহারা কোথায় যাইতেছে? গুরুচরণ তাহাও বলিল না। সিধু

বিস্মিত হইয়া চলিতেছিল। বৈষ্ণবী তাহার মুখের দিকে মাঝে মাঝে কেন স্থিরনেত্রে চাহিতেছিল তাহা না বুঝিতে পারিয়া তাহার বিস্ময় আরও অধিক হইতেছিল। কাছারী বাড়ীর পশ্চাতে তাহারা একটা বাটীতে উঠিল। প্রথমে গুরুচরণও তাহার পর সিধু, পশ্চাতে বৈষ্ণবী উঠানে দাঁড়াইল। গুরুচরণ একজন ঝিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গো, মা কোথায়? একবার এদিকে আসতে বলত। ঝি তখন রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল, সে ঝাঁট দেওয়া থামাইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। যে বাড়ীতে কেহ কখন আসেনা, বাড়ীটাই জঘন্য বলিয়া পরিত্যক্ত, সে বাড়ীতে আজ প্রাতঃকালে তিনজন আসিয়া উপস্থিত, আর তাহাদের মধ্যে যে প্রধান সে আসিয়া একবারে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া কি প্রয়োজনের জন্য ডাকিতেছে—ঝি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। গুরুচরণ কহিল—দাঁড়িয়ে রহিলে যে! একবার ডেকে দাওনা? ঝি সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মাকে ডাকিতে গেল।

সিধু তখন হৃদয়ের গুরুভারে ক্লান্ত হইতেছিল। সন্দেহ অবিশ্বাস পূর্ব্ব হইতেই তাহার মনে দেখা দিয়াছিল। এক্ষণে এই কুৎসিত স্থানে গুরুচরণ তাহাকে লইয়া আসিয়া কি করিতে চাহে সে, কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না। ঐ কদর্য্যমুখ বৈষ্ণবীটাই বা কে, উহার উদ্দেশ্যই বা কি? গুরুচরণকে সে চিরকাল শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে, সে কখনই তাহাকে অন্যায় পথে লইয়া যাইবার সহায় হইবে না; কিন্তু এই নষ্ট

বৈষ্ণবী-টা! উহার মন্দ অভিপ্রায় থাকিতেও পারে। তাহা চিন্তা করিয়া সিধুর হৃদয় ক্রোধে, ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইতেছিল। সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহার মুষ্টিদ্বয় তখন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

তাহার মা সিঁড়ি দিয়া নামিতেই গুরুচরণ সিধুকে পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আনিল। তাহার মা ধীর পদক্ষেপে নিকটে আসিল—সম্মুখে সিধুকে দেখিয়া সে ক্ষণকালের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর কণ্ঠে কহিল—আয় বাছা, এতদিন পরে এলি! বলিয়া দুইবাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া আকুলভাবে সিধুর দিকে অগ্রসর হইল। সিধু পিছাইয়া গেল। তাহার হৃদয় তখন একটা অজানা আশঙ্কায় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। গুরুচরণ কহিল "ও যে তোর মা—তুই যে রমণ ঘোষের পালিত ছেলে, এই তোর আসল মা—মা"—বলিয়া গুরুচরণ সিধুর হাত ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিতে চেষ্টা করিল। সিধু জোর করিয়া গুরুচরণের হাত ছাড়াইয়া লইল। তাহার মার সর্ব্বশরীর তখন উদ্বেগে কাঁপিতেছিল। বৈষ্ণবী কহিল—"যাও বাবা, আমি তোমার মার কোল হতে তোমাকে কেড়ে নিয়ে রমণ ঘোষের বউকে বিক্রী করেছিলাম"—বৈষ্ণবীর কণ্ঠ জড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহার চক্ষে জল; সে অধীরভাবে সিধুর হাত ধরিয়া উহার মার নিকটে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। সিধুর রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া একটা অর্দ্ধস্ফুট বাক্য উচ্চারিত হইল—এই

এ আমার মা ! সে বৈষ্ণবীকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। বিষাক্ত সাপ গায়ে উঠিলে লোকে তাহাকে যেমন আতঙ্কে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করে, সেরূপ বৈষ্ণবীর স্পর্শে সে পাপদংশিত হইবে মনে করিয়া উহাকে ভয় ও ঘৃণায় দূরে ঠেলিয়া দিল। বৈষ্ণবী আবার যেই তাহাকে ধরিতে যাইবে, অমনি সিধু পশ্চাতের দরজা দিয়া বাটী হইতে শীঘ্র বাহির হইয়া গেল।

গুরুচরণ বাহির হইয়া দেখিল সিধু তখন কিছুদূর চলিয়া গিয়াছে। সে তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া সে বাটীর দিকে ফিরিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মায়ের ছেলে আজ না হয় কাল মায়ের কোলে ফিরবেই ফিরবে। বৈষ্ণবী তখন ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। "আমি কি করলাম গো, আমি যে তোমার সর্ব্বনাশ করেছি গো" বলিয়া মার পদদ্বয়ের সম্মুখে পড়িয়া সে মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মা তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া স্থিরভাবে উঠানে বসিয়াছিল। তাহার হৃদয় তখন মহাসাগরের তরঙ্গে তোলপাড় হইতেছিল। একি—সে আমায় ত্যাগ করলে ! যার মুখ চেয়ে আমি সব ত্যাগ করেছি, ইহকাল পরকাল হারিয়েছি, আমার হৃদয়ের মাণিক—সে আমার কোলের কাছে এসে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেল—আমি তাকে পাছে ছুঁই তাই পিছনে সরে গেল—আমার ভগ্নবুকের ধন আমাকে পায়ে ঠেলে গেল—আহা, আমার বাছারে ! ঠিক কি তেমনি মুখ চোখ হয়েছে—সে যেন তারই শরীর দিয়ে গড়া !

তাকে দেখে আমার হঠাৎ মনে হল আমি যেন স্বপ্ন দেখছি—যাক সেই স্বপ্নের আনন্দই আমার ভাল, আমার তাকে দেখেই সুখ, এ নারীর দেহ তাকে স্পর্শ করলে তার অকল্যাণ হবে—এত সয়েছি এও সহিব। তাঁকে এ নরকে টেনে এনে দুঃখ দেবনা—কিন্তু সে যে আমাকে একবারও মা বলে ডাকলেনা—আমার তার মুখে একবার মা ডাক শুনতে বড় ইচ্ছে হয়—কতবার আমার হৃদয়ের ভিতর হতে তার মুখে মা মা শব্দ শুনেছি, শুনে আহ্লাদে গায়ে কাঁটা দিয়াছে—আমার সর্ব্বশরীর তার মা মা ডাকে থর থর করে কেঁপে উঠেছে—আমার মনে হয়েছে সেই মা মা ডাক আমার সমস্ত পাপ লজ্জাকে দূর করেছে! আমার সামনে এসে সে আমায় মা বলে ডাকলে না! আমি পাপী, অপবিত্রা বলে আমার দিকে ভাল করে চেয়েও দেখলে না—হায়রে কপাল! তবু সেই-ই আমার ছেলে, আমাকে ঘৃণা করলেও সেই যে আমার একান্ত আপনার। সে আমায় ঘৃণা করুক—আমার দিকে না চাক্, আমার দিকে না আসুক—আমি আমার বাছাকে চেয়ে চেয়ে দেখব—সে মুখ না তুললেও চেয়ে চেয়ে দেখব—আমাকে কাছে আসতে না দিলে, তাড়িয়ে দিলেও দূর হতে চেয়ে দেখব। সে আমায় কখনও মা বলে ডাকবে না, আমি আমার হৃদয়ে তারই মুখে মা বলা শুনব! সে একটিবার যদি আমায় মা বলে ডাকে—হায় সে কি সুখ, কি পুণ্য হবে! আমায় সে কি একবারও মা বলে ডাকবে না? ডাকবে না? একবারও

ডাকবে না? যদি সে শুনে আমি তার জন্য কত সয়েছি, তা শুনেও ডাকবেনা? আমার কাছে শুনে আমার বাছা আমার দুঃখ বুঝবে না? সে আমায় চিনতে পেরেছে ত? আমাকে চিনল না বলেই আমার কাছে এল না, তাই নয় ত? আমার বোধ হয় সে চিন্তে পারে নাই—আমি তাকে বড় দেখছি, কিন্তু সে যখন আমায় দেখেছিল, তখন তার যে বয়স অতি কম—সে যে চিন্তে পারে নাই—তাই সে চলে গেল—মাকে কখন সে পায়ে ঠেলতে পারে, না, জেনে কি কেউ তাকে ঘৃণা করতে পারে? সে জানেনা আমি তার মা—কিন্তু না, এরা নিশ্চয়ই তাকে বলেছে আমি তার মা, তা না বলে কি আমার নিকট নিয়ে আসে? আমায় মা জেনে সে ত্যাগ করলে, আমি তার মা—এত অপবিত্র, এত ঘৃণিত, এত কুৎসিৎ! তাই আমায় সে পায়ে ঠেললে। করুক, ক্ষতি কি? যার জন্যে আমার এ পাপ, তার হাতে দণ্ড না পেলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে কেন? তাই ভাল, অবিশ্বাস করুক, আমার দিকে ফিরেও না চাক্। আমি সব সহ্য করতে পারব। একবার ত তার দেখা পেয়েছি, সেই আমার পরম সুখ!

হীনতার কলঙ্ক

সিধু বাটী ফিরিয়া গিয়া কাহারও সহিত কথা কহিল না। সুধা তাহার বিমর্ষ ভাবের কারণ জানিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। অনেকক্ষণ পরে সিধু থামিয়া থামিয়া উহার নিকট সব ঘটনা প্রকাশ করিল। সুধা সিধুর উপর সব বিষয়েই নির্ভর করে—ঘরকন্নার বিষয়েও সে অনেক সময়ে সিধুর পরামর্শ না লইয়া চলিতে পারে না। এক্ষণে সিধুকে হতবুদ্ধি দেখিয়া সুধা কি বলিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। সিধুর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা দিতেছিল, অথচ সুধা তাহার চিন্তা লাঘব করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছিল না। সে এত অল্পবুদ্ধি বলিয়া আপনাকে খুব ধিক্কার দিতেছিল।

সিধু আজ সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। তাহার স্ত্রীর বুদ্ধি তাহাকে কিছুই সাহায্য করিল না, স্ত্রীর ভালবাসাও তাহাকে পথ দেখাইতে পারিল না। সে মধ্যাহ্নের আহার না করিয়াই দোকানের দিকে গেল। পথে ভাবিতে ভাবিতে সে দেবিদাসকে এ বিষয় সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসা করিবে ঠিক করিয়া তাহারই বাটীতে গেল। দেবিদাস তখনও দ্বিপ্রহরের পূজা সারিয়া উঠে নাই। সিধু বাহিরের ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। বসিয়া সে আকাশ পাতাল অনেক কি ভাবিতে লাগিল। দেবিদাস যখন পূজা সাঙ্গ করিয়া পশ্চাতের দরজা দিয়া নিঃশব্দে

প্রবেশ করিল তখন সিধু কিছুই জানিতে পারে নাই। সে তখনও বসিয়া কি ভাবিতেছিল। দেবিদাসের মুখে চিন্তার রেখা। সে পূজায় আজ শান্তি, আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই, তাই সে একটু বিষণ্ন মনে আপনার হৃদয়ের ভার বহিয়া ক্লান্তভাবে ভিতর হইতে বাহিরে আসিল,—তাহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত, তাহার চক্ষুর দৃষ্টি তখনও অন্তর হইতে বাহিরের জগতে সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া আসে নাই।

সিধু তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে, দেবিদাসের চিন্তার গতির প্রতিরোধ হইল। দেবিদাস জিজ্ঞাসা করিল,—কিরে, এ সময়ে যে? সিধু বিচলিত ভাবে কহিল,—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।—তাহার ওষ্ঠদ্বয় একটু কাঁপিয়া উঠিল, সে মৌনভাবে মাটির দিকে চাহিল। দেবিদাস একটু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল—"অমন করছিস কেন, কি হয়েছে বল।" সিধু একটু থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিল,—"আমার মাকে না কি পাওয়া গেছে। আমাকে যারা মানুষ করেছিল, তারা আমার মা বাপ নয়—।" সে দুঃখ সিধু সহ্য করিতে পারিল না, রমণ ঘোষ ও তাহার স্ত্রী যে তাহার বাপ মা নয় এ কথা সে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না, স্বীকার করিলে যে তাহার জীবনের স্নেহের বন্ধন এক নিমেষে কে ছিঁড়িয়া দেয়, তাহার শৈশবের সব স্মৃতি এক মুহূর্ত্তে একবারে মুছিয়া দেয়! সিধুর চোখে দুই এক ফোঁটা জল ভাসিয়া উঠিল। দেবিদাস উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—কে তোর মা? রমণ

ঘোষ তোর বাপ নয়? সিধু তখন সংক্ষেপে দেবিদাসকে প্রভাতের ঘটনা বিবৃত করিল। দেবিদাস একটু ঘৃণা ও আশ্চর্য্য মিশ্রিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—নায়েবের বাড়ীর সেই কায়স্থ মেয়েটা তোর মা, তার চরিত্র ত ভাল নয়। সিধু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ, সেই আমার মা। দেবিদাস পুনরায় কহিল—সে কি—সে যে রক্ষিতা! সিধু কোন উত্তর না দিয়া অন্যদিকে চাহিল,—তাহার সত্যকার অথবা কল্পিত মা সম্বন্ধে এ সব কথা সে শুনিতে চাহেনা,—দেবিদাসের কথা তাহার নিকট রূঢ় বোধ হইল। সে একটু উত্তেজিতভাবে কহিল—হ্যাঁ, তা আমি কি করব! দেবিদাস জিজ্ঞাসা করিল—তুই, তা হলে তার কাছে যাবি? সিধু কহিল—আমি তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। দেবিদাস একটু জোরের সহিত কহিল,—আমি ত তোকে যেতে বলতে পারিনি,—অমন অপবিত্রা মা হলেও তার বাতাস লাগা মহাপাপ, মহাকলঙ্ক,—সে মার কাছে ছেলের কর্ত্তব্য নেই, যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে সে হচ্ছে, মা ও ছেলের সম্বন্ধ ত্যাগ করা—বলিস কি,—অমন কলঙ্কিনী সে কখনও ছেলের ভক্তি, ভালবাসার পাত্র হতে পারে? না, সে মা নয়, তুই তার কাছে যাস্‌নি, তার কাছে গেলে তোর নরক হবে—হলেই বা তোর মা,—সে যে—ছিঃ—দেবিদাস এমন একটা ভাব দেখাইল, যে সে একটা কোন কথা মনে করিতে যেন আপনার হৃদয়কে মলিন করিতেছে। সে, সে ভাব হৃদয় হইতে দূর করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া

বাঁচিল। সিধু দেবিদাসের নিকট বিদায় লইয়া তাহার দোকানে গেল।

প্রেমাত্মিকা

সিধু যখন মধ্যাহ্নে আহার না করিয়াই আপনার দোকানের দিকে গেল, তখন সুধা আপনাকে নিতান্ত দোষী সাব্যস্ত করিতেছিল—তাহার হৃদয়ের নির্ম্মল আকাশে একখণ্ড মেঘ আসিয়া অন্ধকার করিয়া দিল, সে অন্ধকারে দিশেহারা হইল—বুদ্ধির স্নিগ্ধ জ্যোতি সে অন্ধকার দূর করিয়া তাহাকে ও সিধুকে একটা পথ দেখাইয়া দেয়—কিন্তু তাহার বুদ্ধি নাই, সে সে পথ দেখিতে পাইল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সে আপনার ও সিধুর চিন্তায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল—হঠাৎ হৈমীর কথা তাহার মনে পড়িল। তাহার স্বামী রমেশ বাবু গ্রামের প্রধান মাতব্বর, তিনি সকলকেই ত পরামর্শ দেন। হৈমীকে বল্‌লে তিনি একটা পরামর্শ দেবেনই। সুধা কালবিলম্ব না করিয়া হৈমীর নিকট গেল। হৈমী তখন পাড়ার প্রতিবেশীদিগের অনেকগুলি বালক-বালিকাকে পড়াইতেছে। সুধা আসিয়া কহিল—একটা কথা বলব, একটু এধারে এস। বালকবালিকাগণকে পড়িতে বলিয়া হৈমী সুধার নিকট আসিল।

হৈমী তাহার গোপনীয় কথা শুনিয়া সহসা হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, বলিল, "ভগবান্ তবে এতদিনে সদয় হয়েছেন। আহা ঐ স্ত্রীলোকটী ছেলের দুঃখে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে, সে কথা দাদার কাছে শুনেছিলাম। উনি তাঁর ছেলের খোঁজ করতে আমাকেও বলেছিলেন, অনেকের নিকট খোঁজও করেছিলাম, কিন্তু কোন খোঁজ পাই নাই। উনি বলেছিলেন স্ত্রীলোকটী তার ছেলের জন্যে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছিল, তবুও ছেলেকে রক্ষা করতে পারেনি। আমার তাই শুনে বড় দুঃখ হয়েছিল—আহা মার প্রাণ সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য কিনা করতে পারে বল! সেই ছেলেকে হারিয়ে তার প্রাণটা যে কি হয়েছিল, তা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাই বুঝি, সিধুকে দেখাইলে চিনতে পেরেছে! না, বৈষ্ণবী গুরু-চরণ তাকে আগে বলে দিয়েছিল?" সুধা কহিল—"ওকে দেখে কিছুক্ষণ সে থমকে দাঁড়িয়ে রহিল, তারপর ঝাঁপিয়ে ওর উপর পড়তে যাচ্ছিল—কিন্তু ও সরে গেল"—হৈমী জিজ্ঞাসা করিল, "সিধু তাকে অবিশ্বাস করলে কেন?" সুধা কহিল—"তা আমি জানি না—সে তো আগে কখনও শুনে নাই যে, যে তাকে মানুষ করেছে সে তার মা নয়—গুরুচরণকে সে বিশ্বাস করেছিল—কিন্তু ঐ বৈষ্ণবীকে সে কি জানি কেন ঘৃণা করে—বৈষ্ণবীর কথা বলতে সে মনে করে তার পাপ হচ্ছে—এমনি সে হয়েছে"—হৈমী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এখন কি হয়? আহা সেই স্ত্রীলোকটার কত দুঃখ বল দেখি! যার জন্য

সে পতিত হল সেই তাকে পতিত বলে নিলে না—আপনার মাকে চিনলে না"—হৈমীর গভীর সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে সুধার হৃদয় আন্দোলিত হইল। সুধা ব্যস্ত হইয়া কহিল—"আমি দোকান হতে তাকে নিয়ে সেখানে যাই—আমি বললে সে শুনবে—মাকে কি কেউ ফেলতে পারে? আমি তাকে বলব উনি তাকে খুঁজে পেলে কত সুখী হতেন—সে না আসতে চাইলে আমি আমাদের ঘরে তার মাকে নিয়ে আসব।" হৈমী কহিল—"তুই একটু দাঁড়া, উনি ঘরে বসে কি কাজ করছেন, আমি একবার জিজ্ঞেস করি—তুইও না হয় আয়।" সুধা কহিল —"না, আর জিজ্ঞেস করে কি হবে আমি এখনি দোকানে, যাই, দোকান হতে তাকে নিয়ে তার মার কাছে যাব" হৈমী হাঁ না কিছু বলিল না। সুধা তাহাদের বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিধু যখন সুধার নিকট শুনিল যে, রমেশ বাবু সেই পুত্রহারা রমণীর কথা জানিত তখন তাহার হৃদয় বিশ্বাস ও সংশয়ের দ্বন্দ্বে উৎপীড়িত হইতে লাগিল। তাহার এমন অবস্থা হইল যে, এ দ্বন্দ্বের তাহাকে অবিলম্বে মীমাংসা করিতে হইবে —ভুলই হউক বা সত্যই হউক, তাহাকে একটা পথ অবিলম্বে বাছিয়া লইতে হইবে—এ দ্বন্দ্বের গুরুভার আর সে কিছুতেই বহিতে পারে না। সুধা যখন অনুনয় করিয়া কহিল—সেই তাহার মা, তখন সিধু একবার ভাবিল, বেশ তাহাই হউক; কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেবিদাসের কথা তাহাকে সজোরে আঘাত

করিয়া কহিল—কি সেই রক্ষিতা তাহার মা! সিধু সুধার অনুনয় শুনিল না, সে দ্বন্দ্ব দূর করিতে পারিল না। সুধা, অনেকক্ষণ অনুনয় করিল, শেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল—সে কহিল সিধু তাহার মাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা দিয়াছে; সিধু এত নিষ্ঠুর সে তাহাকে আবার পীড়া দিবে—পুত্র হইয়া মাতার হৃদয়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিবে। সিধু আর থাকিতে পারিল না—সুধার সজল চক্ষু তাহার হৃদয়ে অনুতাপ জাগাইয়া দিল—সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু জোরের সহিত কহিল—আচ্ছা সেই আমার মা, চল তার কাছে। সিধু ও সুধা খুব ব্যস্তভাবে কাছারী বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর দরজা খোলা ছিল—একতলায় কাহারও শব্দ নাই, বোধ হইল কেহই নাই। সিধু ও সুধা উদ্বিগ্নতা বশতঃ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দ্বিতলে গেল। দ্বিতলের সম্মুখের ঘরে একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক নীচু খাটের উপর বসিয়াছিল; তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল সে খুব কাঁদিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কাঁদিতে না পারিয়া সে মাঝে মাঝে এক একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল। তাহার সম্মুখে একটা জানালা খোলা ছিল, জানালা দিয়া নীলাকাশের এক খণ্ড দেখা যাইতেছিল, সে তাহার দিকে একটা বেদনা-হীন বিষাদপূর্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। ঘরে ঢুকিবার দরজা তাহার পিছন দিকে, যখন দরজা খুলিল সে একবার ঘুরিয়া দেখিল না কে আসিয়াছে; সে মনে করিয়াছিল ঝি ঘরে

ঢুকিতেছে। কেহ কখনও আসিতে পারে এ আশা সে ত্যাগ করিয়াছে, তাহার হৃদয় নিরাশার অন্ধকারকে চিরকালের জন্য বরণ করিয়াছে। নিরাশার অন্ধকার না আলো! তাহার মনই তাহা জানে। নীলাকাশ-নিবদ্ধ তাহার নিরাশ দৃষ্টি এক নীলবরণ হৃদয়-দুলালকে যে পায় নাই তাহা কে বলিতে পারে? তবুও তাহার দৃষ্টি নিরাশ ছিল; তাহার সজল চক্ষু, তাহার বিষাদাচ্ছন্ন মুখ বেদনাব্যঞ্জক ছিল—সুধা ও সিধু তাহা দেখিল। সুধা সম্মুখে ছিল, সে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইল, সিধু তাহাকে ইঙ্গিতে জানাইল—অই তাহার মা। তারপর দুইজনে রমণীকে প্রণাম করিতেই সে তাহাদের দিকে উল্লাসিত অথচ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সুধা তাহার অস্বাভাবিক মৃদু ও আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—মা ফিরে চাও, দেখ আমরা যে তোমাকে নিতে এসেছি। রমণীর হৃদয়ের পাষাণের বাঁধ একবারে ভাঙ্গিয়া গেল—রমণী বহুকাল মা ডাক শুনে নাই, দীর্ঘরজনী ধরিয়া সে আপনারই কণ্ঠে মা ডাক শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে, মনে করিয়াছে তাহার স্নেহের দুলাল তাহারই কণ্ঠে মা মা বলিয়া ডাকিতেছে! আজ তাহার সেই স্নেহের দুলাল সম্মুখে, কিন্তু এ কে, এ অপরিচিতার সম্বোধন যে তাহার মাতৃহৃদয়কে তোলপাড় করিয়া ব্যাকুলভাবে আহ্বান করিয়াছে! এত ব্যাকুলতা, এত তীব্র আবেগ, এত উচ্ছৃঙ্খল স্নেহ—সে ত কখনও অনুভব করে নাই। সে শুধু কহিল—'বাছা আমার'—বলিয়া সংজ্ঞাহীনের

মত একবার সুধা আর একবার সিধুর মুখের দিকে চাহিতে-ছিল। সিধু কহিল "মা, ও তোমার বৌ ; আমাদের ঘরে চল— আমি জানতাম না, আজ—বড় দোষ করেছি, মা মা," করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। রমণী সিধুর দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই হাত আপনাপনি বদ্ধ হইয়া গেল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরাম জল পড়িতে লাগিল, সে কিছুই দেখিতে পাইলনা। তাহার হৃদয়ের বহুকালের সঞ্চিত দুঃখ-আবেগ আজ মর্ম্মন্তুদ হইয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিল, তাহার চেতনা লোপ করিল, সে কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। সিধু ও সুধার সম্মুখে একটা পাষাণের মূর্ত্তি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে রমণী সুধাকে কহিল—"আয় বাছা, আমার বুকে আয়"—পতিতার বুকে পবিত্রা অনেকক্ষণ রহিল। পতিতার চক্ষুর জল পবিত্রার বদ্ধ কবরী ধুইয়া দিল।

তখন অপরাহ্ণ, সূর্য্যাস্ত হইতেছে। সূর্য্যের শেষ কিরণ সম্মুখের দরজায় প্রবেশ করিয়া, সিধুর মস্তক স্পর্শ করিয়া, সুধার সিন্দুর-রেখাঙ্কিত কেশগুচ্ছকে উজ্জল করিয়া, রমণীর অশ্রুসজল চক্ষুর উপর পড়িল। রমণীর স্মৃতিফলকে আর এক দুঃখ-বিষাদ বিজড়িত অতীত অপরাহ্ণের সূর্য্যের রক্তিমপ্রতিমা প্রতিবিম্বিত হইল।

সুধার পরে সিধুও আবার মাকে অনেক সাধিল, বলিল "মা, তোমাকে আমি না চিন্তে পেরে, না বুঝ্‌তে পেরে, অবহেলা করেছিলাম, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, চল তোমার নিজের ঘরে চল।" রমণী কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিল

না। তাহার পর কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না বাছা, সে আর হয় না, তোমার মুখ দেখেই সুখ, ওমুখে আর কালি দিতে যাব না।"—সিধু ও সুধা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া অতি গভীর দুঃখের সহিত বাড়ী ফিরিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের বিষাদ সান্ধ্য অন্ধকারে মিশিয়া গেল। তাহারা চলিতেছিল, সান্ধ্য সমীরণে কোথা হইতে একটা গান বহিয়া আনিয়া কানে কানে শুনাইয়া গেল—

কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা,
আমি পথের ভিখারী নহি গো।

গানের সব পদ শুনা যাইতেছিল না, তবুও যাহা শুনা যাইতেছিল তাহা এক মাতৃহৃদয়ের গভীর দুঃখে সম্মিলিত হইয়া তাহাদের হৃদয়কে তোলপাড় করিতেছিল।

মম সঞ্চিত কত পুণ্য
আমি সকলি করেছি শূন্য
তুমি পূর্ণ করিয়া ভরি দিবে তাই
রিক্ত হৃদয় বহি গো—

* * *

প্রকৃতি মাঝে মাঝে যখন উন্মাদিনী মূর্ত্তি লয়, ঘন অন্ধকার রাত্রে যখন মেঘ ডাকে, বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে, তখন রমণী তাহার ঘর ছাড়িয়া বাহির হয়। সিধুদের বাটীর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে ঘরের ভিতর কার আলো দেখে, ঘর হইতে নবপ্রসূত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে, বালক বালিকা-

দের আমোদোল্লাস অনুভব করে। লোকে বিদ্যুতের আলোতে তাহার আলুলায়িত কুন্তল, তাহার উন্মত্তের মত ভাব দেখিয়া ভয় পায়, তাহাকে উন্মাদিনী বলে। ঘরের প্রদীপের আলোতে সিধু ও সুধা তাহার মৃদুমন্দ হাসি, তাহার আনন্দোজ্জল করুণাময় মুখ দেখিয়া তাহাকে তাহাদের মা বলিয়া চিনিতে পারে। মা তাহাদের স্নেহের ভিখারী হইয়া ঘরের দ্বারে অপেক্ষা করে, অনেক সাধিলেও সে তাহাদের ঘরে আসে না। আপনার ঘৃণিত বাটীতে ফিরিয়া যায়।

বিশ্বপ্রেমাত্মিকা

দেবিদাসের মনের চাঞ্চল্য আরও অধিক হইয়াছে। সে সংসারে থাকিয়া আপনার হৃদয়ে শান্তি আনিবার এক উৎকট চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে মানুষ সেখানেই মানুষের সুখ দুঃখ, সেই জন্য মানুষের সংস্পর্শই সে ত্যাগ করিয়াছে। মানুষের সুখ দুঃখ এতদিন তাহাকে এমন একটা কর্ম্মজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যাহাতে তাহার আত্মার স্বাধীনতা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কর্ম্মের উত্তেজনা তাহার আত্মার উন্নতিবিধানের অন্তরায় হইয়াছিল। সে আপনার আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। অনেক পূজা অর্চ্চনা করিল, সে তৃপ্তি পায় নাই, কিছুতেই পায় নাই।

একেত পূর্ব্ব হইতে সে নিজের অতৃপ্তিতে অস্থির ; সম্প্রতি সে নিজের দুর্ব্বলতা আরও নিদারুণ ভাবে অনুভব করিল।

সে সিধুকে তাহার মাকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল—সিধু তাহা শুনে নাই, সেই মাকেই মাথায় করিয়াছে, তাহার মনে কোন দ্বিধা আসে নাই, সে পতিতাকেই মাতৃপদে বরণ করিয়াছে। তাহার প্রথমে মনে হইয়াছিল ওটা সিধুর অমার্জ্জিত ধর্ম্মবুদ্ধি—কিন্তু এখন তাহার মনে হইতেছে, উহা সিধুর নিবিড় ভক্তির নিদর্শন। দেবিদাসের এত বিদ্যাবুদ্ধি, সে এত পূজা অর্চ্চনা করে, কিন্তু তাহার হৃদয় সিধুর হৃদয় অপেক্ষা হীন, দুর্ব্বল! ইহাতে তাহার অতৃপ্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। সে ভাবিতে লাগিল সিধুর মত তাহার ভক্তি নাই বলিয়া তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই। যে সিধুকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা সে হীন। অথচ তাহার একটি গুপ্ত অহঙ্কার ছিল, সে কত লোকের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হইয়াছে!—আজ তাহার নিজের মনুষ্যত্বের থর্ব্বতা প্রকাশ পাইল। অন্তরের অতৃপ্তি তাহার জীবনকে অতি যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিল। এত করিয়াও তাহার হৃদয়ে কি একটু শক্তি নাই? এত করিয়াও সে কি একটু শান্তির প্রত্যাশী হইতে পারে না? সে নির্ম্মম, কঠোর,—সে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে, সংসার ত্যাগ করিয়াছে, আপনার বুভুক্ষিত হৃদয়ের প্রতিমাকে নিজ হাতেই নিষ্ঠুরভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছে, তবুও তাহার হৃদয়ে শক্তি নাই, শান্তি নাই! আর সিধু—আমার আর হ'ল না, আর হ'বে না,—আমি সংসারী হই নাই, কিন্তু এ যে সংসারী অপেক্ষা আরও অশান্তি, আরও অতৃপ্তি

আবার সেই আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়কে উৎকট আনন্দে অভিভূত করিয়া বাহির হইল, চল—চল—চল—আর নহে, চল। বাহিরের উদার আকাশের উদার মুক্তির জন্য চল, সহস্র প্রাণের উন্মত্ত অশান্তির মধ্যে অতি গভীর অতি গুহাহিত শান্তির জন্য চল—বহুর মধ্যে সহস্রলোকের মধ্যে যিনি লোকালোক অচলের ন্যায় স্তব্ধ, তাঁহার স্তব্ধতার মধ্যে স্তব্ধ হইবার জন্য চল—চল।

* * * * *

মানুষের কর্ম্মের, সুখ দুঃখের যেখানে একান্ত অবসান হয়, সেই বেদনাবোধশূন্য নিবিড়শান্তির স্থান এক জনহীন স্তব্ধ শ্মশানে যাইয়া দেবিদাস এখন আপনার শান্তি খুঁজিতেছে।

বিস্তৃত শ্মশান। নিকটে গ্রাম নাই, লোক নাই;—এক বিজন অরণ্য। শ্মশানের পার্শ্বে স্তব্ধ হইয়া কতকগুলি চিতা জ্বলিতেছে তাহার সংখ্যা লইতেছে, ধূ ধূ করিয়া চিতা শ্মশানের চারিদিকে জ্বলিতেছে, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না।

শ্মশানের পশ্চাতে নিবিড় অরণ্যের সম্মুখে একটা ভগ্ন মন্দির। মানুষের শব্দ সে স্থানে পৌঁছায় না। বাতাস হু হু শব্দ করিয়া মাঝে মাঝে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একটা আনন্দোল্লাস তৃপ্তির কথা জানাইয়া যায়। শৃগাল শকুনি আহার্য্যাধিক্য লাভ করিয়া দূরে অতিদূরে একটা তৃপ্তির কথা জ্ঞাপন করে। শুধু চিতার আগুন একবার নিবিয়া একবার জ্বলিয়া মানুষের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সাক্ষ্য দিতেছে! প্রকৃতি তৃপ্ত,

মানুষের হৃদয়ে চির অশান্তি। মানুষ শ্মশান পর্য্যন্ত সে অশান্তি বহন করে—চিতার আগুন দেহকে দগ্ধ ভস্মীভূত করে, সে অশান্তি ভস্মীভূত করিতে পারে না। যেখানে মানুষ সেই খানেই অশান্তি। বিজন অরণ্যের সম্মুখে, দিগন্ত-বিস্তৃত শ্মশানের প্রান্তদেশে, এক ভগ্ন মন্দির শান্তির আবাসভূমি। সে ভগ্ন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী, মহাকালী। তাঁহার সম্মুখে সমাসীন দেবিদাস।

অন্ধকার রাত্রি। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশের চারিদিকে ঘন ঘন বিদ্যুৎ হাসিতেছে। ভগ্ন মন্দিরে বসিয়া নিবিষ্টমনে দেবিদাস মহাকালীর রূপ দেখিতে লাগিল। দেবিদাস মা'র এলোকেশী, দিগম্বরী মূর্ত্তি দেখে আর ভয় পায় নাই। মার কালরূপ আজ বিশ্বভুবন আলো করিয়া লইয়াছে—মার অট্ট অট্ট হাসি বিশ্বকে মোহিত করেছে—মার ভ্রূকুটিকুটিল মুখ দেখিয়া বিশ্ব আনন্দে পুলকিত হইয়াছে।

দেবিদাস উন্মাদিনী প্রকৃতির সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। যাহা কিছু ভীষণ, ভয়ঙ্কর তাহার সহিত প্রেমের যোগ অনুভব করিতেছে। উন্মাদিনী প্রকৃতিকে সে ভাল বাসিতেছে;—আজ সে প্রকৃতির সুষমা মাধুরীতে মুগ্ধ নহে। সে বিদ্যুতের সহিত হাসিয়া আলাপ করিতেছে, বজ্রধ্বনির সহিত আপনার হৃদয়ের কথা মিশাইতেছে। শ্মশানের কোণে বসিয়া সে আপনাকে মানুষ করিতেছে। উন্মাদিনী প্রকৃতি তাহাকে দীর্ঘ রজনী ধরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তি দিল—বিদ্যুতের প্রভা তাহার চক্ষে উজ্জ্বল আলোক দিল—ঝঞ্ঝা

বাতাস তাহার হৃদয়ে উন্মত্ত প্রচণ্ড আবেগ আনিল, বজ্রপাত তাহার কণ্ঠে ভীম মহাশব্দ প্রদান করিল, অন্ধকার রজনীর শ্মশানের চিতার আলোক তাহার করকমল ও অধরপুট রক্তবর্ণ করিল; নিবিড় কৃষ্ণমেঘ তাহার বাহুর বেষ্টনে মৃত্যুর স্নিগ্ধ ভয়ঙ্কর সম্ভাষণ প্রদান করিল।

উন্মাদিনী প্রকৃতির স্বরূপ ভগ্ন মন্দিরে প্রকাশিত হইল। মার উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখে দেবিদাস আজ ভীতত্রস্ত নহে, সে উন্মাদিনীর নিকট অভয়লাভ করিয়াছে,—আনন্দে সে উৎফুল্ল হইয়া জননীর মৃদু হাসি দেখিতে দেখিতে তাঁর চরণ-যুগল আঁকড়াইয়া ধরিল। মার মূর্ত্তি ক্রমশঃ বিরাট্ হইতে আরও বিরাট্ হইতে লাগিল, বিশ্বভুবনজোড়া একমূর্ত্তি প্রকাশ হইতে লাগিল,—অস্থিমাত্র সার, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, এক মধুর ভীষণ উন্মাদিনী মূর্ত্তি বিশ্বভুবনকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল! মার ব্রহ্মরন্ধ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হিঙ্গুলায় এক উগ্র কোমল জ্যোতিতে কোট্টরীরূপে উদ্ভাসিত হইল, জ্বালামুখীতে মার ধীহাজিহ্বা রক্তপান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া অম্বিকার রূপ ধারণ করিল, কাশ্মীরে মার অসংখ্য নরমুণ্ডমাল-সুশোভিত কণ্ঠদেশ মহামায়া-রূপ ধারণ করিল, জালন্ধরে মার রুধির-আপ্লুত স্তনযুগল ত্রিপুর-মালিনীর রূপ ধরিয়া সন্তানকে আহ্বান করিতে লাগিল, মার ভীমবাহু মহাখড়্গাঘাতে চট্টলদেশে ভবানীর উগ্রতেজ প্রকাশ করিল, উজ্জয়িনীতে মার কর্পূর ভীষণ মঙ্গলচণ্ডিকার রূপ ধারণ করিল, প্রভাসে মার মহোদর চন্দ্রভাগারূপে নিখিলমানবের

মহাপাপরাশি হরণ করিল, বিরজা ক্ষেত্রে মার নাভিদেশ বিমলারূপে শোভা পাইল, গোদাবরীতীরে মার বাম গণ্ড বিশ্ব-মাতৃকারূপে বিশ্বকে আহ্বান করিল, আর লঙ্কায় মার চরণ-নূপুর ইন্দ্রাণীরূপে ভক্তহৃদয়কে আকর্ষণ করিল।

সেই অতিবিস্তৃতবদনা, অসংখ্যনরমুণ্ডমালাশোভিতা বিচিত্রখট্বাঙ্গধারিণী মহাভয়ঙ্করী, বিরাটবিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তি দেবিদাসকে কি ইঙ্গিত করিল। তাহার অঙ্গে অঙ্গে সেই উন্মাদিনীর শক্তি বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল,—শিরায় শিরায় রক্ত মহোৎসবে নাচিয়া উঠিল। তাহার হৃৎপিণ্ড করালিণীর হুঙ্কারের সহিত সুর মিলাইয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার অধীর হৃদয়ে সেই করালী কপালী নাচিতে লাগিল। নৃত্যের তালে তালে তাহার হৃদয় এক অজানা আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। জন্মজন্মান্তরের সুপ্ত অহঙ্কার যাহা এতদিন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আত্মার অবাধ প্রসারে প্রতিরোধ করিয়া হৃদয়ে অশান্তি নিরানন্দ আনিয়াছিল, তাহা করালিণীর খড়্গাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল, এক মহাচিতার আগুনে দগ্ধ ভস্মীভূত হইল—সে ছিন্নমুণ্ড করালিণীর করকমলে শোভা পাইল, সে উন্মাদ কোলাহল শুভশঙ্খধ্বনির মত অতি মধুর শুনাইল, চিতার ধূম ধূপধূনা পুষ্পের সুরভি আনিল, আমিত্বের একান্ত বিনাশে তাহার আত্মা আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। তার প্রেম আজ উন্মাদ-বীভৎস-মূর্ত্তি লইয়া তাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে লাগিল। সে

প্রেম আজ জগতের কোন নিন্দা ভয় গ্লানিকে জানিল না, নিন্দা ঘৃণাকে বরণ করিয়া লইল! বিশ্বপ্রেম বিবসনা অতিকুৎসিত রূপ ধরিয়া তাহার নিকট ধরা দিল! চিরনগ্নায় কুললক্ষ্মীদিগের মত লজ্জা নাই, সতীদিগের মত শ্রদ্ধা নাই, শ্রীভ্রষ্টা বুদ্ধিভ্রষ্টা হইয়া সেই কদর্য্যা চিরনগ্নাই তাহাকে মোহিত করিল। তাহার আমিত্বের বিনাশে সে আজ শুধু শ্রীকে বরণ করিতে পারিলনা। আজ লজ্জা-শ্রদ্ধা-শ্রী-হীনা পরমকুৎসিতা তাহাকে সমানভাবেই আহ্বান করিল। আজ সে শুধু ভালকে ভাল বাসিল না, বিশ্বের সমস্ত মন্দ অতি কদর্য্য অতি বীভৎস বেশে তাহার ভালবাসা আকর্ষণ করিল। তাহার বিশ্বপ্রেম ঐ উন্মাদিনী পরমকুৎসিতার রূপ পরিগ্রহ করিয়া, পরম শিব কল্যাণকে সঙ্গে করিয়া, তাহাকে লোকালয়ে অনন্ত কর্ম্মসাগরের দিকে আহ্বান করিল। তাহার মমতাবন্ধন ছিঁড়িয়া গেল, আশা আকাজ্ক্ষা, সুখ সম্পদ, জীবন মৃত্যু, অহঙ্কার আমিত্বকে ধ্বংস করিয়া, শিব কল্যাণকে বশীভূত করিয়া, সে অজর অমর হইয়া, অসীম প্রেম অসীম শক্তি লইয়া দাঁড়াইল। তাহার সহিত নিখিল মানব, আত্মীয় স্বজন প্রীতি মমতা সব ভুলিয়া উন্মাদ আবেগে বিশ্ব-প্রেমের পথে ছুটিল। বাধা বিঘ্ন, আপদ বিপদের প্রতিকূলে শক্তি তাহার সহায় হইল—অনন্ত আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া তাহার প্রতি রোষ-কষায়িত নয়নে চাহিল, কিন্তু শত শত উল্কাপাতের পরিবর্ত্তে আকাশ হইতে প্রেমের পুষ্পবৃষ্টি হইল, এক ভৈরব-নিনাদ অসীম গগন মন্থন

করিয়া দিঙমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে নিষেধ করিতে চাহিল, কিন্তু ভৈরব নিনাদের পরিবর্তে প্রেমের মোহন বাঁশী শুনা গেল। প্রলয়-বহ্নি-ধূম ত্রিভুবনকে অন্ধকার করিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ করিতে চাহিল, কিন্তু প্রেম মৃত্যুর অন্ধকারে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক জালিয়া পথ দেখাইল—সে ছুটিল! প্রেম দেবতার কদর্য্য বীভৎসরূপের আকর্ষণে, ভীষণ আরক্ত ত্রিনয়ন ও রক্তপানে উন্মত্ত রক্ত অধরপুটের আকর্ষণে, সে আকুল আবেগে ছুটিল, সেই ভয়াল ভীষণ মরণচুম্বনের প্রতীক্ষায় উদ্বেগবিকম্পিত হইয়া ছুটিল।

দেবিদাস বুঝিল সে বিশ্বময়ীর বিশ্বপ্রেমের এক কণা পরিমাণ লাভ করিতে পারিয়াছে। ধূর্জ্জটীর প্রেম-গঙ্গা-বিধৌত জটার একখণ্ড, নীলকণ্ঠের বিশ্বের পাপগরলের একবিন্দু, সে বরণ করিতে পারিবে, শাশ্বত ভিখারী দেবতার অঙ্গে বিশ্বের সমস্ত অভাব, ঘৃণা, লজ্জা, গ্লানি যে বিভূতিরূপে শোভা পাইয়াছে, তাহার অণুপরিমাণ সে নিজ অঙ্গে মাখিতে পারিবে। কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া গেল, সে নিষ্কাম ব্রতসাধনের জন্য মহামায়ার একবিন্দু শক্তিলাভ করিয়াছে। তাহার শিরায় শিরায় নূতন প্রেম, নূতন প্রাণের উদ্বেগসঞ্চার! লোকালয় হইতে বহুদূরে মহাশ্মশানের এক প্রান্তে বিজন কাননে ভগ্ন-মন্দিরের দেবতা তাহাকে নূতন ব্রতে ব্রতী করিয়াছেন। দেবিদাস সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য লোকালয়ে ফিরিয়া চলিল।

পরিশিষ্ট

একজন গৌরকান্তি গৈরিকবেশধারী সন্ন্যাসী কাঞ্চনতলা গ্রামের প্রান্তদেশের সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া কেয়াবনের ঝাড় অতিক্রম করিয়া পানের বরোজের সম্মুখ দিয়া চলিয়া আসিতেছে। তখন দ্বিপ্রহর—রাস্তার তপ্তধূলা তাহার চরণে পীড়া দিতে লাগিল। সে দ্বিগুণ বেগে পথ হাঁটিয়া চলিল। উষ্ণ বাতাস তাহার ললাটে, ওষ্ঠপুটে, কর্ণমূলে সজোরে আঘাত করিল। সে দ্বিগুণ উৎসাহে চলিতে লাগিল। তাহার পদদ্বয় ক্লিষ্ট, তাহার কণ্ঠ শুষ্ক, তাহার চক্ষুদ্বয় ক্ষীণ, কিন্তু সে অনেকটা পথ চলিয়া আসিল। একটা বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে একবার চারিদিকে চাহিল, তাহার পর বাটীর দরজায় ঘা দিল। দরজা বন্ধ—ভিতর হইতে কেহ খুলিয়া দিলনা। সে একবার ডাকিল। কেহই সাড়া দিলনা। সে দরজায় জোরে আঘাত করিয়া ডাকিল—'জয় হোক মা, চারটি ভিক্ষা দাও।' দ্বিতলের ঘরে একজন রমণী তাহার ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—'এত রোদে দেখত, কে ভিক্ষা চাচ্ছে?' ঝি নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সে কহিল,—দাঁড়াও, ভিক্ষা দিচ্ছি। রমণী দ্বিতলের সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকট আবার ভিক্ষা চাহিল। রমণী তাড়াতাড়ি নীচে আসিল। ইতিমধ্যে ঝি ভাণ্ডার ঘর হইতে একবাটী চাউল ভিক্ষা দিবার জন্য লইয়া আসিতেছিল। রমণী তাহার হাত হইতে বাটীটি লইয়া অগ্রসর হইল। রমণী ভিক্ষা দিতে যাইলে সন্ন্যাসী কহিল—ভিক্ষা নেব কি, আমাকে ভিক্ষা দিতে পারবে? রমণী অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—

ভিক্ষা ত এনেছি, আবার কি ভিক্ষা দেব ? সন্ন্যাসী কহিল—ও ভিক্ষা আবার ভিক্ষা কি ? ও ভিক্ষা ভিক্ষা নয়, আসল ভিক্ষা দিতে পারবে ?

রমণী নিশ্চল ও মৌনভাবে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী আবার কহিল—কি ভাবছ—ভিক্ষা দিতে পারবে ? সন্ন্যাসীর সৌম্য ও প্রসন্ন মুখশ্রীর নিকট রমণী আত্মসমর্পণ করিল ; সে মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—পারব। সন্ন্যাসীর মুখে একটা আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল—পারবে ? পারবে, বেশ ; তবে আমার সঙ্গে চল। রমণী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাব ? তাহার ওষ্ঠপুটে হাসি দেখা গেল। কিন্তু সে এখনও দ্বিধা করিতেছিল। সন্ন্যাসী কহিল—চল, এখনই বুঝবে ; তোমার ছেলের কাছে চল—রমণী মন্ত্রমুগ্ধা হইয়া সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিল।—

* * * *

সেদিন সিধুর বাটী মাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম ও পুত্রবাৎসল্যের ত্রিস্রোতা মন্দাকিনী ধারায় পবিত্র হইল। সিধুর গৃহে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান হইল। কিন্তু সন্ন্যাসীকে কেহ চিনিল না। দেবিদাস তাহার পরিচয় দান করিল না। সিধুও তাহাকে চিনিতে পারিল না, সুধাও পারিল না। যে জগতের গুরুভার বহিয়া আপনার মাথায় করিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্তে প্রেমগঙ্গা আনিয়াছে—জগতের শান্তি-শ্রী-কল্যাণ যাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে—তাহাকে কেহ চিনিল না ! অনন্ত জগতে অনন্ত প্রেম বিলাইবার জন্য, অনন্ত জগতের অনন্ত কল্যাণ বিধানের জন্য, সে অন্নপূর্ণার ভিখারী সাজিয়া দীনহীন অজ্ঞাত কাঙ্গাল বেশে সমাজে ফিরিতে লাগিল।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা।

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু, সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালা-দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি কি এইরূপ সুলভে দেওয়া যায় না? অধুনা দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে—হায়, যদি কাটতি অধিক হয় এবং মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কারণ এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; এ অবস্থায় 'আট-আনার গ্রন্থমালা' কেন চলিবে না?—সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা এই অভিনব চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লীসমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালা দেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ উদ্যম প্রথম। আমরা অনুরোধ করিতেছি, বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই ...র স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। এই সিরিজের—প্রকাশিত হইয়াছে—

১। অভাগী—শ্রীজলধর সেন।

২। ধর্ম্মপাল—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ।

৩। পল্লীসমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। কাঞ্চনমালা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

৫। বিবাহবিপ্লব—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।

৬। চিত্রালি—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্।

৭। দূর্ব্বাদল।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

৮। শাশ্বত ভিখারী—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ।

৯। ঘর বাড়ী—(যন্ত্রস্থ) শ্রীজলধর সেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।